"....বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় গৃহস্থকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি তাঁর গৃহে কোনো সাপ বা টিকটিকিও বাস করে, তবে তারাও যেন অভুক্ত না থাকে। এই নিম্নস্তরের জীবেরাও যাতে খেতে পায় তার ব্যবস্থা বৈদিক সমাজে ছিল; সুতরাং প্রতিটি মানুষ তো খেতে পেতই। বৈদিক সমাজে গৃহস্থ ব্যক্তিরা মধ্যাহ্ন ভোজন করার আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতেন, 'যদি কেউ এখনও ক্ষুধার্ত থাক, তবে এস, খাবার তৈরি হয়ে গেছে।' যদি এই আহ্বানে কেউ সাড়া না দিত, তাহলেই গৃহকর্তা খেতে বসতেন।"

শ্রীল প্রভুপাদ কৃত বৈদিক সাম্যবাদ

পৃ: ১০

আদর্শ গৃহস্থ জীবন

ডঃ প্রেমাঞ্জন দাস

আদর্শ গৃহস্থ জীবন

ডঃ প্রেমাঞ্জন দাস

সঙ্কীর্তন প্রচার বিভাগ
ইস্‌কন, শ্রীধাম মায়াপুর,
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩
দূরভাষ ঃ ০৩৪৭২-২৪৫৪৭৬

© সঙ্কীর্তন প্রচার বিভাগ
ইস্‌কন, শ্রীধাম মায়াপুর,
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩
দূরভাষ : ০৩৪৭২-২৪৫৪৭৬

প্রচ্ছদ : রাজু সরকার

প্রথম প্রকাশন : শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা, ২০০২
দ্বিতীয় প্রকাশন : রথযাত্রা, ২০০৩

কম্পিউটার সেটিং :
পারুল প্রকাশনী

মুদ্রণ :
পারুল প্রকাশনী
৮/৩ চিন্তামণিদাস লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২২৪১ ৬৪৭৪

ভূমিকা

আজ কাল পত্রিকা খুললেই দেখা যায়, 'স্বামী স্ত্রীকে পুড়িয়ে মেরেছেন', কিংবা 'গলা টিপে বধূ হত্যা'—ইত্যাদি। এই সমস্ত স্বামীদের সকলেই যে অশিক্ষিত তা নয়। অনেকেই উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার ইঞ্জিনীয়র পর্যায়ের। আবার স্ত্রীও তার স্বামীকে ছেড়ে অন্যান্য পুরুষের সঙ্গে কাম উপভোগে লিপ্ত হচ্ছেন—এরকম ঘটনাও হামেশাই ঘটছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এ সমস্যা যেন মাত্রাহীন। তবে ক্রমে ক্রমে এই সব সমস্যা পুণ্যভূমি ভারতকেও গ্রাস করছে। বিবাহের পবিত্র উদ্দেশ্য আজ বিলুপ্তির পথে। এমত অবস্থায় গৃহস্থ আশ্রম সম্পর্কিত বৈদিক শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। গৃহস্থ জীবন সম্পর্কে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং বৈদিক শিক্ষার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক রয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা অনুসারে বিবাহকে সাধারণত বৈধ বেশ্যাবৃত্তি (Legal prostitution) বলে গণ্য করা হয়। আর বৈদিক শাস্ত্রে গৃহস্থ জীবনকে আশ্রম বা মন্দিরের মতোই পবিত্র বলে গণ্য করা হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে স্বামীর গায়ে একটু ঘামের গন্ধ হলে কিংবা স্বামী ঘুমের মধ্যে নাক ডাকলে, স্ত্রী তাকে চিরতরে পরিত্যাগ করতে পারেন। অনেক সময় স্ত্রী বলেন, "লোকটি আমার যৌন চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। সুতরাং বিবাহ-বিচ্ছেদ অত্যাবশ্যক।" ঐ দেশের স্বামীরাও ঐ রকম। একজন পুরুষের বহু উপপত্নী কিংবা একজন স্ত্রীর বহু উপপতি এক অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। স্ত্রী তার স্বামীকে খুন করেছেন—এরকম ঘটনাও মাঝে মধ্যে ঘটে। ঐ দেশে প্রকাশ্য মঞ্চে যৌন বিকৃতির প্রদর্শনী হয় (যেমন কোনো মহিলা গাধার সঙ্গে কাম উপভোগে লিপ্ত হচ্ছে) এবং হাজার হাজার দর্শনার্থী তা উপভোগ করে। এমন অনেক বিকৃতি আছে যা গ্রন্থে উল্লেখ করার মতো নয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই সমস্ত বিকৃতিতে লিপ্ত অধিকাংশ নারী-পুরুষই বিবাহিত।

সুখের নেশায় হাজার রকমের যৌন বিকৃতির আশ্রয় নিয়ে তারা কিন্তু সুখী হতে পারেনি। বরং সারা দেশ জুড়ে জ্বলে উঠেছে আত্মহত্যার আগুন—অশান্তির বিষবাষ্প। আগুনে হাত দিয়ে তারা বুঝতে পেরেছে, বৈদিক শিক্ষা কতো নির্ভুল।

আমরা জানি, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যৌন বিকৃতি এখনো পাশ্চাত্যের সম পর্যায়ে পৌঁছায়নি। কিন্তু Prevention is better than cure. রোগ হওয়ার আগেই প্রতিষেধ প্রয়োজন। আবার রোগ হলেও ঔষধ প্রয়োজন। আমাদের এই 'আদর্শ গৃহস্থ জীবন' গ্রন্থটি একই সঙ্গে প্রতিষেধ এবং ঔষধের কাজ করবে।

এই গ্রন্থ রচনায় সমস্ত কৃতিত্ব ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের। সমস্ত দোষ আমার। শ্রীল প্রভুপাদের চিঠিপত্রকে ভিত্তি করে এই গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। এতে গৃহস্থ আশ্রম সম্পর্কে বৈদিক শিক্ষার সার কথা গুলির যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বৈদিক সিদ্ধান্ত গুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

১। যৌন তৃপ্তি বিবাহের মূল লক্ষ্য নয়, আনুষঙ্গিক মাত্র।
২। সুসন্তান লাভই বিবাহের উদ্দেশ্য। বিবাহ-বিচ্ছেদ সুসন্তান গঠনের প্রতিবন্ধক এবং তাই বিবাহ বিচ্ছেদ অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ।
৩। স্বামী স্ত্রী এবং সন্তান মিলে পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হবে—তাহলেই গৃহস্থ জীবন আশ্রমের সমতুল্য হয়ে উঠবে।
৪। সংযম এবং সহিষ্ণুতা বিবাহ জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পত্তি। মহাভারতের নল-দময়ন্তী কাহিনী, রাজা হরিশ্চন্দ্র এবং শৈব্যার কাহিনী—ইত্যাদি বহু কাহিনী পাশ্চাত্য-শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষাই আমাদের দিয়ে থাকে।

গৃহস্থ জীবন সম্পর্কে বৈদিক শিক্ষা যেন এক অমূল্য রত্ন সম্ভার। এই পুস্তিকায় আমি কেবল মুষ্টিমেয় রত্ন সম্ভার-এর জ্যোতি উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি। বর্তমানে দিগ্‌ভ্রান্ত যৌন জীবনে আমাদের এই ছোট্ট গ্রন্থটি অমৃতের মতো কাজ করবে—এই আমাদের বিশ্বাস। পাঠকেরা নিঃসন্দেহে অশেষ ভাবে উপকৃত হবেন। গ্রন্থটিতে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি হতেই পারে। সকলের কাছে সে ব্যাপারে আমি ক্ষমা প্রার্থী। পাঠকদের কাছে প্রার্থনা বৈদিক শিক্ষার বিরোধিতা না করে যদি কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নজরে পড়ে, তাহলে আমাকে জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা করা হবে। হরেকৃষ্ণ।

ইতি বিনীত
প্রেমাঞ্জন দাস
রাধাষ্টমী ১৪/০৯/২০০২ ইং

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

১। অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ
২। বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গি
৩। সাত্ত্বিক জীবন
৪। ভগবান কে?
৫। গুরু ত্যাগ

সূচিপত্র

সকল বর্ণ ও আশ্রমের একই লক্ষ্য

দেহত্যাগের পূর্বেই যৌনবাসনাকে কমাতে কমাতে শেষ পর্যন্ত যদি শূন্যের কোঠায় নামাতে না পারি তা হলে পুনরায় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তন অবশ্যম্ভাবী। যৌনবাসনার সামান্য গন্ধও যদি অবশিষ্ট থাকে, তা হলেও পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। তাই বৈদিক পরিকল্পনা হল, দেহত্যাগের পূর্বেই যৌনবাসনাকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হবে। আর দেহত্যাগ তো যে-কোনো মুহূর্তেই হতে পারে।

তাই ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসী—সকলেরই এক চেষ্টা এবং তা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় তীব্র উন্নতির মাধ্যমে (তীব্রেণ ভক্তিযোগেন) যৌনভাবনাকে শূন্য করে দেওয়া। কারণ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির চক্রটি বড়ই ভয়ঙ্কর।

ব্রহ্মচারী তার শৈশব থেকেই চেষ্টা করেন যৌনবাসনাকে শূন্যের কোঠায় নামাতে। সফল হলে তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যের ব্রত গ্রহণ করে আজীবন ব্রহ্মচারী থেকে কৃষ্ণভাবনায় দ্রুত অগ্রগতি লাভ করেন। ব্যর্থ ব্রহ্মচারী গৃহস্থ আশ্রম বরণ করেও একইভাবে চেষ্টা চালিয়ে যান। বুদ্ধিমান গৃহস্থ এই দুঃখের জগতে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে কষ্ট পেতে মহাভয় পান। তাই চতুর গৃহস্থও চেষ্টা করেন তার যৌন বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে শূন্যের কোঠায় নামাতে। তাই শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের প্রয়োজন ছাড়া তিনি যৌনবাসনার আগুনে ভোগের পেট্রোল ঢালেন না। যদি ঢালেন, শ্রীকৃষ্ণও তাকে অনন্তবার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘোরাতে প্রস্তুত। সুতরাং গৃহস্থ হলেও যৌনবাসনাকে শূন্যের কোঠায় নামানোর যে লক্ষ্য, তার কোনো পরিবর্তন করা উচিত নয়।

যদিও ৫০ বছর বয়সে বানপ্রস্থের বিধান রয়েছে, কিন্তু তার আগেও

তো আমাদের মৃত্যু হতে পারে। সুতরাং ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত গৃহস্থ জীবন যাপনের মানে এই নয় যে তিনি যৌনবাসনাকে শূন্য করার সংগ্রাম থেকে বিরত হবেন। অবশ্য ৫০ বছর বয়সের পর সকলকেই বানপ্রস্থ এবং কার্যত সন্ন্যাস নিতেই হবে। বাইরের বিচারে চার বর্ণ এবং চার আশ্রম। কিন্তু অভ্যন্তরে সকলেরই এক লক্ষ্য—কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে যৌনবাসনাকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে রোধ করা।

সন্ন্যাসের উপযুক্ত সময়

শ্রীল প্রভুপাদ ইসকনকে শুধু মুষ্টিমেয় ভক্তমণ্ডলীর মঠ রূপে গড়তে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন কৃষ্ণভক্তের একটি বিপুল সমাজ (Society) গড়ে তুলতে।

১৯৭২ সালের ১৭ ডিসেম্বর শ্রীদানবীর প্রভুকে লেখা একটি চিঠিতে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, পারমার্থিক প্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাসম্মত ব্যবস্থাপনায় যদি একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ আমাদের বিকশিত করতে হয়, তা হলে বহু মহিলাও সেখানে থাকবে। এই সমাজে তারা কি করবে? তারাও শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসেছে। আমরা তাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। তাই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর অনেক শিষ্যকে বিবাহিত হওয়ার পরামর্শ দেন। শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন,

"আমি একজন গৃহস্থ ছিলাম, আর আমার গুরু মহারাজ ছিলেন আজীবন ব্রহ্মচারী। কিন্তু আমরা দুজনেই একই সেবা গ্রহণ করেছি এবং কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করছি। তা হলে গৃহস্থ আর ব্রহ্মচারীর কী পার্থক্য থাকল?"

(শিক্ষামৃত, পৃঃ ৮৬৮)

আমাদের সব কিছুই ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় লাগানোই হচ্ছে প্রকৃত সন্ন্যাস। সেই অর্থে একজন সন্ন্যাসীর মতো হৃদয়ের অধিকারী

এবং আচরণকারী একজন গৃহস্থও সন্ন্যাসীর সমপর্যায়ভুক্ত—যদিও তার স্ত্রী এবং বহু সন্তান-সন্ততি থাকতে পারে।

স্ত্রী যদি উন্নত ভক্ত হয়, সে স্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণকে সানন্দে মেনে নেবে। তবে স্ত্রী যদি উন্নত ভক্ত না-ও হয়, তবুও তাকে অসময়ে ত্যাগ করা অনুচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রীল প্রভুপাদ কখনই তাঁর স্ত্রীর আচরণ পছন্দ করতেন না, কিন্তু তিনি জানতেন যে, সন্তানরা বড় না হওয়া পর্যন্ত সন্ন্যাস গ্রহণ সম্ভব নয়। তাই শুধুমাত্র কর্তব্যের খাতিরে তিনি উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করেছিলেন। সন্তানেরা বড় হলে তিনি গৃহত্যাগ করেন।

বিবাহিত পত্নীকে অন্ততপক্ষে একটি সন্তান দান করা স্বামীর কর্তব্য। যাতে স্ত্রীও খুশি হবে এবং জীবনভর ব্যস্ত থাকার একটি সুযোগ পাবে। স্ত্রী মাত্রেই মা হতে চায়। স্ত্রীকে সন্তান দান না করে অসময়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে সে খুব সুখী হবে না। পারমার্থিক সমাজে এরকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা আমাদের বাঞ্ছনীয় নয়।

কৃপণ এবং ব্রাহ্মণ

নামেমাত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিষয়-ভোগে গা ভাসিয়ে দিলেই তাকে গৃহস্থ বলা যায় না। সেই ধরনের তথাকথিত গৃহস্থদের গৃহমেধী বলা হয়। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজ এই সমস্ত গৃহমেধীদের বর্ণনা করে নিম্নোক্ত শ্লোকটি বলেছেন ঃ

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধীসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥

(ভাঃ ৭/৯/৪৫)

এই শ্লোকে যৌনসুখকে গৃহমেধীদের প্রধান সুখ বলে বর্ণনা করা হল। এই সুখ কী রকম? না, চুলকানির মতো। কারও হাতে যখন চুলকানি হয়, তখন সে চুলকিয়ে এক ধরনের আরাম পায়। কেউ চুলকানি রোগ কামনা করে না। সবাই চুলকানিকে ঘৃণা করে। যার সারা শরীরে চুলকানি, লোকে তার কাপড়-চোপড় পর্যন্ত স্পর্শ করতে ভয় পায় কিংবা ঘৃণা করে।

অতএব এই চুলকানির সুখ শুধু তুচ্ছ সুখ নয়, তা জঘন্যও বটে। কারও হাতে যখন চুলকানি হয়, তখন মাঝে মধ্যেই চুলকানোর জন্য এক রকমের সুড়সুড়ি জাগে। যদি কোনো ব্যক্তি সেই প্রাথমিক সুড়সুড়িটাকে সহ্য করতে পারে, তা হলে দেখা যায়, তার চুলকানি খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেরে যায় এবং তা শরীরের সর্বত্র ছড়ায় না।

কিন্তু যে ব্যক্তি সেই সুড়সুড়িতে অধীর হয়ে পড়ে, সে তৎক্ষণাৎ চুলকাতে শুরু করে। চুলকানোর সঙ্গে সঙ্গে সে এক ধরনের আরাম পায় এবং সেই আরামের বশবর্তী হয়ে সে তখন আরও চুলকায়। চুলকাতে চুলকাতে যখন রক্ত বেরিয়ে আসে, তখন সে বাধ্য হয়ে চুলকানো বন্ধ করে। আবার একটা সাময়িক বিরতির পর সে আবার চুলকায়। এইভাবে ঘা ক্রমশ বড় হতে থাকে এবং সারা শরীরে তা ছড়িয়ে পড়ে।

তথাকথিত গৃহস্থরা, যাদের কোনো চিন্ময় জ্ঞান নেই, তারা আসলে এরকম চুলকানোর আনন্দে মগ্ন। সারা শরীরে দগদগে ঘা হয়ে গেলে চর্মরোগীর চুলকানি বরং বেড়েই যায়। ঠিক তেমনি অতিরিক্ত যৌন ভোগের ফলে ভোগবাসনা শুধু বাড়তেই থাকে।

ন জাতু কামঃ কামানাম্
উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব
ভূয় এবাভিবর্ধতে॥

(ভা : ৯/১৯/১৪)

আগুনে ঘি ঢাললে আগুন শুধু বাড়তেই থাকে। জীবনে যে যত বেশি ভোগ করবে, তার ভোগবাসনাও তত বেশি প্রবল হবে। জ্বালানি বন্ধ করে দিলে আগুন নিভতে বাধ্য। ভোগ বন্ধ হলেই ভোগবাসনা দুর্বল হয়ে পড়বে। আর শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির স্বাদ পেলে, কাম সম্পূর্ণ নির্মূল হবে। কাম তখন প্রেমে রূপান্তরিত হবে।

যে সমস্ত গৃহমেধীরা সেই উন্নত স্বাদের গন্ধটুকুও পায়নি, এই তুচ্ছ সুখকেই তারা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ বলে গণ্য করে। আসলে তা দুঃখ ছাড়া কিছুই নয়। যারা এই দুঃখজনক চুলকানির সুখে আসক্ত, তারাই কৃপণ, ক্ষুদ্রচেতা। তারা কখনোই তৃপ্ত হয় না। ইন্দ্রিয়ভোগের চর্বিতচর্বণ করে করে তারা অধীর আর উন্মাদ হয়ে ওঠে।

যারা ধীর, তারাই ব্রাহ্মণ। বোকা, কৃপণ এবং মূর্খদের প্রাপ্য দুঃখকষ্ট কখনোই তাদের ভোগ করতে হয় না। সেই ধরনের ধীর ব্যক্তিই যথার্থ গৃহস্থ। আর অধীর উন্মত্ত, তথাকথিত গৃহস্থরাই গৃহমেধী।

আগুন আর মাখন

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, নারী হল আগুনের মতো, আর পুরুষ হল মাখনের মতো। যখন আগুন এবং মাখনকে যথেষ্ট ব্যবধানে রাখা হয়, তখন মাখন গলতে পারে না। কিন্তু যখন আগুন ও মাখনকে পাশাপাশি রাখা হয়, তখন মাখন তো গলবেই, উপরন্তু, আগুন আরও প্রবলভাবে জ্বলে উঠবে। অবশেষে মাখনও নিঃশেষিত হবে, আগুনও স্তিমিত হবে।

এইজন্য বৈদিক শাস্ত্রে নারী এবং পুরুষকে কঠোরভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক যুগের মানুষ উদারতার নাম করে নারী-পুরুষের এই দূরত্বকে আর বজায় রাখতে চাইছে না। বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলি এ ব্যাপারে একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

কিন্তু 'ফলেন পরিচীয়তে'। ফল দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এই অবাধ সংমিশ্রণ কত ভয়াবহ। নারী-পুরুষের এই অবাধ মিলনেরই ফলশ্রুতি স্বরূপ বহু গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। ক্ষণিকের উত্তেজনায় তারা তথাকথিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। কিছু দিন যেতে না-যেতেই ঘটছে বিবাহবিচ্ছেদ।

পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ নারী-পুরুষই জীবনে কম করেও নয়-দশ বার বিয়ে করে। কাতারে-কাতারে অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম হচ্ছে। তারা উপযুক্ত স্নেহ-ভালবাসা পাচ্ছে না। অসংখ্য গর্ভপাত, আত্মহত্যা, খুন,—এই সমস্ত সামাজিক সমস্যার মূল কারণ হল নারী-পুরুষের এই অবাধ মিলন।

তাই, আধুনিকতা এবং নারী স্বাধীনতার নাম দিয়ে বোকা লোকেরা যাই করুক না কেন, বুদ্ধিমানদের সতর্ক হতে হবে। বৈদিক মানদণ্ড অনুযায়ী, কোনো অবিবাহিত নারী এক রাতের জন্যও যদি ঘরের বাইরে গিয়ে থাকে তবে কেউ তাকে বিবাহ করবে না। এমনকি বিবাহিতা নারীও এক রাতের জন্যও যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা
নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবান্ ইন্দ্রিয়-গ্রামো
বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

(ভা ঃ ৯/১৯/১৭)

আধুনিকতার নাম করে এমনকি নিজের মেয়ে, বোন, কিংবা মায়ের সঙ্গেও নির্জনে কাছাকাছি অবস্থান করবে না।

সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এমনকি তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকেও দূরে অবস্থান করতেন। সচরাচর স্ত্রীর মুখও দর্শন করতেন না। স্বয়ং

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁর গৃহস্থ লীলায় এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। বৈদিক যুগে, কি বিবাহিত, কি অবিবাহিত—সমস্ত নারীরাই থাকতেন অন্তঃপুরে। তাঁরা সূর্যদেবকেও সচরাচর দেখতে পেতেন না। মূল্যবান মণিমুক্তার মতো পুরুষ অভিভাবকরা তাঁদের রক্ষা করতেন। সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলারা আচ্ছাদিত পালকিতে করে সসম্মানে বাইরে যেতেন। আর পুরুষেরা বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া অন্তঃপুরে যেতেন না।

বিবাহিত নারী-পুরুষের কর্তব্য—পৃথক পৃথক ঘরে বসবাস করা। *(ভাঃ ৩/৩১/৪০ তাৎপর্য)* একমাত্র গর্ভাধান সংস্কার অনুষ্ঠানকালেই তাঁরা একত্রে বাস করতে পারেন। আর অবিবাহিত নারী-পুরুষ অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে এই দূরত্ব বজায় রাখবেন। এতে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি এবং পারমার্থিক প্রগতি অনিবার্য।

গৃহস্থ জীবনের সমস্যা

কাম-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য নারী পুরুষের সংযোগ অত্যাবশ্যক। আর এই তাৎক্ষণিক সংযোগ থেকে জন্ম নিচ্ছে অজস্র সমস্যা। ব্রহ্মলোক থেকে শুরু করে নিম্নতম লোক পর্যন্ত সর্বত্রই, সমস্ত শ্রেণীর জীব এই ব্যাপারে কম-বেশি একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। মূর্খ মানুষেরা প্রতি মুহূর্তে এই সংযোগের ভয়াবহ পরিণতি লক্ষ্য করছে। কিন্তু তবুও তা বর্জন করার জন্য পর্যাপ্ত বুদ্ধি তাদের একেবারেই জাগ্রত হয় না। একেই বলা হয় *পশ্যন্নপি ন পশ্যতি (ভাঃ ২/১/৪)* অর্থাৎ দেখেও দেখে না।

দেখেও যে দেখে না, তাকেই বলা হয় জড়বাদী। সত্যিকারের জড়বাদী বা অসুর জানে কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা মন্দ। কিন্তু তবুও সে পাপ না করে থাকতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধৃতরাষ্ট্র জানতেন, তিনি

পাপ করছেন। তিনি জানতেন, শ্রীকৃষ্ণ হলেন ভগবান এবং তাঁর সন্তুষ্টিবিধান করা প্রতিটি জীবের কর্তব্য। একবার তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে তা স্বীকারও করেছিলেন। কিন্তু তবুও কার্যক্ষেত্রে তিনি তা অনুসরণ করতে পারেননি। কাম, ক্রোধ, লোভ—এই সমস্ত রিপুগুলি এতই প্রবল যে, কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিও এদের দমন করতে ব্যর্থ হয়ে পড়ে। সে জ্ঞানী হলেও অভক্ত। একমাত্র শুদ্ধ ভক্তই কামের বেগ সম্পূর্ণ সহ্য করতে পারেন। না হলে প্রতি মুহূর্তে কামের ভয়াবহ কুফল লক্ষ্য করলেও, *পশ্যন্নপি ন পশ্যতি (ভা ঃ ২/১/৪)*—দেখেও না দেখার মতো তা কেবল ভোগই করে যেতে হবে। অর্থাৎ আমরা জড়বাদীর স্তরেই থেকে যাব।

এই কুফল সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার জন্যই বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত কঠোর ব্রহ্মচর্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ছেলেদের ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত এমন এক পরিবেশে রাখা হত, যেখানে স্ত্রী-সঙ্গের কোনো সুযোগই থাকত না। এইভাবে ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে ছাত্ররা তার সুফল সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করত এবং কাম উপভোগের ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন হত। তাই সত্যিকারের ব্রহ্মচারীর পক্ষেই যথার্থ গৃহস্থ হওয়া সম্ভব।

স্বামীর যোগ্যতা

সাধারণত নারীজাতির জড় কামনার কোনো শেষ নেই। প্রচুর অর্থ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হলে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা খুবই কঠিন। নারীজাতির প্রধান তিনটি চাহিদা হল ঃ

১। অপর্যাপ্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদা, ২। সুন্দর সুন্দর পোশাক এবং অলঙ্কারের চাহিদা ও ৩। যৌন তৃপ্তির চাহিদা। কোনো পুরুষ যদি নারীর

উপরোক্ত তিনটি চাহিদা মেটাতে না পারে, তা হলে সেই সংসারে সমস্যার শেষ নেই। কিন্তু সমস্যা হল, এই চাহিদাগুলি পরিপূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত করা কখনোই সম্ভব হয় না। যখনই কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর এই সমস্ত চাহিদাগুলি পূরণ করার জন্য কোমর বেঁধে লেগে পড়েন, তখন কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে যায়।

তা হলে এই সমস্যার সমাধান কি? এই সমস্যার সমাধান করতে হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই তীব্রভাবে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করতে হবে। স্বামীর কর্তব্য, স্ত্রীকে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত রাখা। যদিও স্ত্রীজাতির ভোগবাসনা অনেক বেশি, তবুও তাঁদের একটা বিশেষ যোগ্যতা আছে যা পুরুষের ক্ষেত্রেও ততটুকু নেই। সেটা হল তাঁদের হৃদয়ের সরলতা। কোন নারী যখন কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাঁর সরল ভক্তি বিশ্বাস পুরুষের থেকেও বেশি।

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই দেখা যায়, পুরুষদের থেকে নারীদের ধর্মপ্রবণতাই যেন অধিক প্রবল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে মহিলাদের সমাগমই বেশি হয়ে থাকে।

একটা সরল শিশুকে যেমন কুপথে চালিত করা সহজ, তেমনি সুপথে চালিত করাও সহজ। নারীরাও অনেকটা শিশুর মতো। তাই স্বামীর কর্তব্য হল তাঁর স্ত্রীকে এমনভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত করা যাতে স্বতস্ফূর্ত ভাবেই স্ত্রীর জড় চাহিদা কমে যায়। পাশাপাশি স্ত্রীর পর্যাপ্ত ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীকে অবশ্যই নিতে হবে। কিন্তু স্বামীর মূল দায়িত্ব হল স্ত্রীকে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত করা। শ্রীমদ্‌ভাগবতে (৫/৫/১৮) বলা হয়েছে, যে পতি তার স্ত্রীকে 'কৃষ্ণভাবনা' দানের মাধ্যমে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে না, সেই ব্যক্তি স্বামী হবার যোগ্য নয়।

বিবাহের ছাড়পত্র

যে সমস্ত ব্রহ্মচারীরা গৃহস্থ হবেন বলে ভাবছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা উচিত। গৃহস্থ জীবনে সমস্যার শেষ নেই। সেসব সমস্যার সমাধান করতে করতে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করা অনেকের পক্ষেই কঠিন হয়ে পড়ে।

তাই যিনি কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি করার জন্য আন্তরিকভাবে নিষ্ঠাবান, তিনি যথাসম্ভব স্ত্রীসঙ্গ (কিংবা স্ত্রীর পক্ষে পুরুষ সঙ্গ) বর্জন করবেন। গৃহস্থ আশ্রমের এই সব সমস্যার কথা ভেবেই দূরদর্শী এবং ভাগ্যবান ভক্তরা ব্রহ্মচর্য কিংবা সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন।

কিন্তু যাদের এতটুকু ভাগ্য উদয় হয়নি, যারা যৌন কামনাকে দমন করতে অক্ষম, তারা যাতে গেরুয়া কাপড় পরে ভণ্ড ব্রহ্মচারী বা ভণ্ড সন্ন্যাসীর জীবন যাপন না করে, তাদের জন্য এই গৃহস্থ আশ্রম অবশ্য বরণীয়। এই গৃহস্থ আশ্রম একটা লাইসেন্সের মতো। এই লাইসেন্স বা ছাড়পত্র নিয়ে কোনো গৃহস্থ শুধুমাত্র কৃষ্ণভক্ত সন্তান উৎপাদনের জন্য বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গ করতে পারেন। কৃষ্ণভক্ত সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্য ছাড়া শুধুমাত্র যৌনসুখ উপভোগের জন্য স্ত্রী-সঙ্গ সুকঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

অর্জুন চার পত্নীর স্বামী হয়েছিলেন। তাঁর প্রত্যেক পত্নীর গর্ভে তিনি সন্তান দান করেছিলেন। কিন্তু স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী যখন অর্জুনের সঙ্গে অবৈধ সঙ্গ কামনা করলেন, অর্জুন তখন তা তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। বৈধ সঙ্গ মানেই বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গ এবং তাও আবার শুধুমাত্র সন্তান কামনায়।

তবে অর্জুন চার পত্নী গ্রহণ করেছেন বলে যে-কেউই তা করবে, তা ঠিক নয়। কলিযুগের মানুষ এক পত্নী এবং এক সন্তানের দায়িত্ব নিয়েই হিমসিম খেয়ে যান। অর্জুনের মতো যোগ্য রাজকুমার আজ আর নেই।

তবে কি অর্জুনের ক্ষেত্রে, আর কি সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে, বিবাহের লাইসেন্স কখনই যৌন জীবনের প্রতি উৎসাহদান করার জন্যে নয়। সেটা হল এক অনিবার্য আপস নিষ্পত্তি।

বিবাহ যজ্ঞ

বৈদিক শাস্ত্রে বিবাহকে যজ্ঞ বলা হয়েছে। যজ্ঞ মানেই বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত সেবা। সুতরাং যিনি বিবাহের মাধ্যমে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক কিংবা যিনি ইতিমধ্যেই গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করেছেন, তাঁর জানা উচিত, গৃহস্থের কোন্ কোন্ আচরণে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন এবং কোন্ কোন্ আচরণে তিনি অসন্তুষ্ট হন। কেননা যখন তিনি অসন্তুষ্ট হন, তখন তা আর যজ্ঞ থাকে না, তা হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয় তর্পণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/১১) বলা হয়েছে—

লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্যসেবা
নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥

অর্থাৎ এই জড় জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার ও নেশা করার ব্যাপারে সকল প্রাণীরই স্বাভাবিক রুচি আছে। কিন্তু শাস্ত্রে যে বিবাহ ইত্যাদি যজ্ঞের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্য এইসব স্বাভাবিক রুচিকে উৎসাহ দান করা নয়। বরং কোনো ব্যক্তি যদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কিংবা সন্ন্যাসী হয়ে থাকতে পারেন, তা হলে তা উত্তম। তা হলে শাস্ত্রে কেন বিবাহ, সুরাগ্রহ প্রভৃতি যজ্ঞের নির্দেশ দেওয়া হল? কারণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীসঙ্গের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক জড় রুচিকে নিয়ন্ত্রিত করা। তেমনি সুরাগ্রহ যজ্ঞের মাধ্যমে মদ্যপানকে

নিয়ন্ত্রিত করা। অর্থাৎ মানুষ যেন অবাধ স্ত্রীসঙ্গ, অবাধ নেশা ইত্যাদিতে নিরুৎসাহিত হয়, সেজন্যই এই বিবাহ-বন্ধন, বিভিন্ন যজ্ঞের বন্ধন। আর যখনই কোন ব্যক্তি বিবাহ যজ্ঞের মাধ্যমে অঙ্গীকারবদ্ধ হন, তখন শুধুমাত্র কৃষ্ণভক্ত সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্য ছাড়া শুধুমাত্র ভোগের জন্য এমনকি তাঁর নিজের স্ত্রীর সঙ্গও করতে পারেন না, পরস্ত্রীর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এইভাবে যখন কোনো গৃহস্থ গৃহাশ্রমের অসংখ্য শাস্ত্রীয় বিধি মেনে চলেন, তখনই কেবল বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন। আর তখনই তা যজ্ঞ।

অভক্তদের পরিবেশে কৃষ্ণভাবনা

গৃহস্থদের পক্ষে সব সময় মন্দিরে বসবাস করা সম্ভব হয় না। যদি এমন হয় যে, কোনও কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থকে এমন এক পরিবেশে থাকতে হল, যেখানে প্রায় সবাই অভক্ত, সেক্ষেত্রে গৃহস্থ ভক্তদের হতাশ হওয়া উচিত নয়। একজন যথার্থ কৃষ্ণভক্ত নরকেও সুন্দরভাবে মানিয়ে চলতে পারেন। যিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়, বাইরের কোনও পরিস্থিতিই তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। কারণ তিনি সর্ব অবস্থাতেই চিন্ময় স্তরে অবস্থান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ যখন গৃহস্থ আশ্রমে ছিলেন, তখন তাঁর পরিবার পরিজন কৃষ্ণভাবনার অনুকূল ছিল না। তিনি যেহেতু ওষুধের ব্যবসা করতেন, তাই সব সময়েই তাঁকে এখানে-সেখানে যাতায়াত করতে হত এবং বহু বিষয়ী মানুষের সঙ্গ করতে হত। বাইরের বিচারে তাঁকে একজন ঘোর ব্যবসায়ীর মতোই ব্যস্ত থাকতে হত। কিন্তু তাঁর চেতনা ছিল সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়। ভাগবতে বলা হয়েছে ঃ

নারায়ণপরা সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থ দর্শিনঃ॥
(ভাঃ ৬/১৭/২৮)

একজন নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তি কোথাও ভয় পান না। স্বর্গ, অপবর্গ, কিংবা নরকপ্রাপ্তি—সর্ব অবস্থাতেই তিনি সমদর্শী। কারণ তাঁর চেতনা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ। তাই জড় জগতের কোনো গুণই তাঁর চেতনাকে প্রভাবিত করতে পারে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন ঃ

গৃহে থাক, বনে থাক,
সদা হরি বলে ডাক।
—(*গীতাবলী*)

এখানে 'গৃহে থাক' বলতে সাধারণত গৃহস্থদের কথাই বোঝানো হয়েছে। গৃহস্থ ভক্তরা গৃহে অবস্থান করলেও, তাঁদের চেতনাকে সর্বদাই বৈকুণ্ঠ চেতনায় রূপান্তরিত করতে হবে। চেতনা যদি বৈকুণ্ঠ বা বৃন্দাবন হয়ে ওঠে, তখন নরকও বৈকুণ্ঠ বা বৃন্দাবন। স্থান নয়, তৎপর সেবাবৃত্তিই শুদ্ধ ভক্তের তৃপ্তির উৎস।

সুতরাং মন্দিরবাসী ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী ছাড়া শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হওয়া অসম্ভব—এই ধারণা ত্যাগ করতে হবে। বরং মন্দিরবাসী হয়েও, ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর পোশাক পরেও একজন নারকীয় জীবন যাপন করতে পারে। তাই প্রতিটি গৃহস্থকেই জোর দিতে হবে ভাব বা চেতনার উপর। তা হলেই ভাবগ্রাহী জনার্দন সন্তুষ্ট হবেন।

যথার্থ গৃহাশ্রমী কখনও উপেক্ষিত নন

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ধারায় অধিকাংশ ভক্তই গৃহস্থ। মহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্তবৃন্দ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত গৃহস্থ বৈষ্ণবের সংখ্যাই বেশি। স্বয়ং মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুও জীবশিক্ষার জন্য গৃহস্থ আশ্রমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বৈষ্ণব আচার্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন গৃহস্থ। স্বয়ং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীমদ্

ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদও বহু বছর গৃহস্থ আশ্রমে অবস্থান করেই কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা ভালভাবেই জানতেন যে, এই অধঃপতিত কলিযুগে গৃহস্থ আশ্রমের সমাদরই হবে সবচেয়ে বেশি। তাই আদর্শ গৃহস্থ আশ্রমের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত স্থাপিত না হলে বেশির ভাগ মানুষ গৃহস্থ আশ্রমের নামে গৃহমেধী জীবন যাপন করবেন। তাই শুধুমাত্র আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই মহাপ্রভু এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা গৃহস্থ আশ্রম বরণ করেছিলেন। সুতরাং গৃহস্থেরা বৈষ্ণব সমাজে উপেক্ষিত নন।

অনেকে প্রশ্ন করেন, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর গৌড়ীয় মঠে গৃহস্থদের আশ্রয় দেননি, কিন্তু ইসকনে গৃহস্থরা একেবারে মন্দিরের মধ্যেই আশ্রয় পেয়ে যাচ্ছেন, সেটা অশাস্ত্রীয় কি না?

সাধারণত ভুল বোঝাবুঝি থেকেই এই ধরনের প্রশ্ন জাগে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আদেশেই শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বৈষ্ণব ধর্মাদর্শ প্রচার করেন সারা বিশ্বে। তাঁর এই বিশ্বব্যাপী প্রচারের ফলেই গড়ে ওঠে বিশ্ব বৈষ্ণব সমাজ (Society)। মঠ যখন সমাজে পরিণত হল, তখন স্বাভাবিকভাবেই বৈদিক সমাজবিধি অনুসারে চার বর্ণ এবং চার আশ্রমের সমস্ত অনুগামীরাই তার অন্তর্ভুক্ত হলেন।

স্বয়ং মহাপ্রভুর সময়েও গড়ে উঠেছিল এক বিপুল বৈষ্ণব সমাজ। *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত* এবং *শ্রীচৈতন্য ভাগবতাদি* গ্রন্থসমূহ তৎকালীন গৃহস্থ বৈষ্ণবদের কাহিনীতে পরিপূর্ণ এবং তাঁদের প্রত্যেকের গৃহই ছিল এক-একটি কৃষ্ণমন্দির।

নিন্দুকেরা চিরকালই নিন্দা করবে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যখন প্রথম গাড়িতে চড়ে প্রচার করেন, তখন অনেকেই তাঁর নিন্দা করেছিল—তাঁর আগে কোনো বৈষ্ণব নাকি গাড়িতে চড়তেন না। শ্রীল

ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের আগে কোনো গৃহস্থ মন্দিরে আশ্রয় পাননি বলেই যে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে তাঁদের আশ্রয়দান অশাস্ত্রীয়—এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই ঈর্ষাপ্রসূত। শুদ্ধ গৃহস্থ বৈষ্ণবদের প্রতি এই ঈর্ষা নিঃসন্দেহে অপরাধমূলক।

দুর্গের আশ্রয়ে যুদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মতো। যৌন কামনা হল মায়ার সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন। যে-সমস্ত জীব শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে এই জড় জগৎকে কেবলই ভোগ করতে চায়, তারাই যৌন আকাঙ্ক্ষার দ্বারা মোহিত হয়।

তাই কোনও ব্যক্তি যদি জড় জগতের বন্ধন অতিক্রম করতে চান, তবে তাঁকে অবশ্যই তাঁর যৌন কামনা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সমগ্র বৈদিক সভ্যতার মূল পরিকল্পনাই হল এই যৌন কামনাকে দমন করা।

বৈদিক সমাজে সেজন্য চারটি আশ্রম ব্যবস্থার প্রচলন ছিল—(১) ব্রহ্মচর্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ এবং (৪) সন্ন্যাস। এই চারটি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই তিনটি আশ্রমেই যৌনজীবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র গৃহস্থদের ক্ষেত্রেই পরমাণু পরিমাণ যৌনজীবনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং তাও শুধুমাত্র কৃষ্ণভক্ত সন্তান উৎপাদন করার জন্যই—ভোগের জন্য নয়।

এর অর্থ এই যে, যৌনজীবনকে সর্বত্রই নিরুৎসাহিত এবং নিন্দা করা হচ্ছে। কারণ সেটাই আমাদের জীবনে অশেষ দুঃখের ভিত্তি এবং আমাদের জড় বন্ধন আর চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণের মূল কারণ, এবং সেটাই আমাদের অনন্ত কোটিবার জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির হেতু।

এই জড় জগতে যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মে যৌন কামনা থাকা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু যুক্তিবুদ্ধি এবং সুগভীর দিব্যজ্ঞানের

সাহায্যে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপাশক্তিতে শক্তিমান হয়ে সেই যৌন আবেগকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সকলকেই করতে হবে। সমাজের সকল স্তরে, সকল যুগে, সকল আশ্রম এবং সকল বর্ণের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য।

তবে একটা কথা সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে, কোনও ব্রহ্মচারী যদি অনুভব করে যে, এই বিষয়ে তার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে বা চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ সে যদি উপস্থবেগ ধারণ করতে একেবারেই অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তাকে অবশ্যই গৃহস্থ-আশ্রম বরণ করতে হবে। এমনকি, কোনও যুবক যদি ১৬/১৭ বছর বয়সেও তেমন অক্ষমতা বোধ করে, তা হলে তাকেও গৃহস্থ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত হতে হবে।

যে-সৈনিক সম্মুখসমরে পরাজিত, তাকে অবশ্যই দুর্গের আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। এই কথা শুধু ব্রহ্মচারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে শত্রুর কাছে বশ্যতা স্বীকার করা চলবে না।

ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসীরা মায়ার বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মচারীরাই গৃহস্থ-আশ্রম বরণ করে বিবাহিতা পত্নীরূপ দুর্গকে আশ্রয় করে মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারেন। বানপ্রস্থী কিংবা সন্ন্যাসী কখনোই গৃহস্থ আশ্রমে ফিরে যেতে পারেন না। আর যারাই অবৈধ যৌনসঙ্গে লিপ্ত হচ্ছে, তারাই পলাতক এবং পরাজিত। কোনও পরিস্থিতিতে এই পলায়নী মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

গর্গমুনি নামে শ্রীল প্রভুপাদের এক শিষ্য প্রভুপাদকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যৌন সংযমের ক্ষেত্রে সম্মুখসমর তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন বলে মনে হচ্ছে। শ্রীল প্রভুপাদ তৎক্ষণাৎ তাঁর বিবাহের

ব্যবস্থা করে দেন। তিনি এখন সস্ত্রীক বেশ আনন্দের সঙ্গেই কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করে চলেছেন।

যুদ্ধ জয়ের কৌশল

কোনো ব্রহ্মচারী যখন যৌন জীবনের প্রতি প্রবল আসক্তি বোধ করে, তখন সেই সমস্যার সমাধান কি? সম্মুখ সমরে পরাজয়ের ভয়ে আতঙ্কিত যে সৈনিক, তার কর্তব্য কি? কোনও পরিস্থিতিতেই বৈষ্ণব আচার্যগণ অবৈধ যৌনজীবনকে অনুমোদন করেননি। তা হলে সেই দুর্বল ব্রহ্মচারীর সেই সমস্যার সমাধান কেমন করে হবে?

এই প্রশ্নের দুটি উত্তর হতে পারে—(১) যেহেতু সে দুর্বল, তাকে প্রথমেই চেষ্টা করতে হবে বল সঞ্চয় করার। অবিরাম, আকুল প্রাণে, নিরপরাধে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ এবং কীর্তন করলে বল সঞ্চয় হবে। শুদ্ধভাবে শ্রবণ কীর্তনাদি নববিধা ভক্তির অনুশীলন করলে বল সঞ্চয় হবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবদের সেবার মাধ্যমে সন্তুষ্ট করতে পারলে প্রভূত বল সঞ্চয় হবে। আকুল প্রাণে মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতে হবে, "হে মদনমোহন, হে শ্রীকৃষ্ণ, দুর্বলতাবশত আমি জঘন্য যৌনজীবনের প্রতি আসক্ত হচ্ছি। যদিও আমি যথাসাধ্য এই আসক্তির কবল থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি, আমার আধ্যাত্মিক শক্তির অভাববশত আমি ব্যর্থ হচ্ছি। হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করে তুমি আমাকে অতিরিক্ত চিন্ময় শক্তি দাও। হে বলরাম, আমাকে কৃপা করে পরামার্থিক বল দাও, যেন আমি আর ব্যর্থ না হই।"

মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁর কৃপাশক্তির গন্ধমাত্রও দান করেন, মদনকে নিয়ন্ত্রণ করা তখন কল্পনাতীতভাবে সহজ হয়ে যাবে। তবে তার জন্য অনন্তপ্রকারে, অনন্তভাবে আকুল প্রার্থনা আমাদের করেই যেতে হবে। আর শুদ্ধ ভক্তদের কাছ থেকে যথাসম্ভব কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতে

হবে। শুদ্ধ ভক্তদের লেখা গ্রন্থ পড়তে হবে। শ্রীল প্রভুপাদের রচিত গ্রন্থাবলী, বিশেষ করে তাঁর রচিত কৃষ্ণগ্রন্থে গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার বর্ণনা পুনঃ পুনঃ পড়তে হবে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে শুদ্ধ বৈষ্ণবদের সেবা করার প্রতি। বৈষ্ণবসেবা এবং কৃষ্ণসেবায় এমনভাবে ব্যস্ত থাকতে হবে, মায়া যাতে আক্রমণ করার এক নিমেষ সুযোগও না পায়।

(২) তাতেও যদি কাজ না হয়, তা হলে বুঝতে হবে, হৃদয়ের ময়লা ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে গেছে। বৈষ্ণব অপরাধ, ধাম অপরাধ, নাম অপরাধ—সব অপরাধই পাহাড়ের মতো সঞ্চিত হয়ে আছে। আরও সঞ্চিত হচ্ছে। সেই অবস্থায় পূর্বোক্ত প্রার্থনা ও শ্রবণ-কীর্তনাদি কৃষ্ণসেবা আরও তীব্রভাবে এবং নিরপরাধে চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেই হবে। পাশাপাশি, সম্পূর্ণরূপে গৃহস্থ আশ্রমের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত হতে হবে।

আসলে যে ব্রহ্মচারী কখনই তার ব্রহ্মচর্য ব্রত ভঙ্গ করেনি, তার পক্ষে যৌনবাসনাকে উপেক্ষা করা অনেক সহজ। যে যত বেশি করে সংযম পালন করবে, সংযম করার ক্ষমতাও তার ততগুণ বাড়তে থাকবে। যে যত বেশি করে অসংযত হবে, তার সংযম করার ক্ষমতাও ততগুণ কমে যাবে। এই বিপদের কথা স্মরণে রেখে কঠোরভাবে সংযম করতে হবে।

যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা, টেলিভিশন, ভিডিও, চলচ্চিত্র ও যৌন উদ্দীপক গ্রন্থাদি ব্রহ্মচর্য জীবনের চরম শত্রু। বর্তমান যুগে এইসব আবর্জনার প্রভাব সর্বত্র। যথাসম্ভব এই সবের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল, ব্রহ্মচারী যদি স্বেচ্ছায় তার যৌনবাসনাকে নিয়ন্ত্রণ না করে, তা হলে তার পতন অনিবার্য। পরিস্থিতি তাকে সাহায্য করবে না।

কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ—যদি সে কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলনে যথেষ্ট শক্তি অর্জন করতে পারে, তা হলে যে-কোনো পরিমাণ যৌন বেগই তাকে আর অস্থির করতে পারবে না। উপস্থবেগ যদি তাকে আক্রমণও করে—তা আসবে এবং চলে যাবে। শুদ্ধ সেবার মাধ্যমে মদনমোহন আর বৈষ্ণবদের মুখে হাসি ফোটাতে পারলে মদন তথা কামদেব অবশ্যই পরাভূত হবে। এই হল যুদ্ধ জয়ের একমাত্র অব্যর্থ কৌশল।

পেট্রোল দিয়ে আগুন নেভানো

এই দেহবদ্ধ জীবনে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু যৌনকামনা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সর্বশক্তিমান, তাই তা আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে পারবে না যদি আমরা শক্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণকে আশ্রয় করি।

অবশ্য কোনো ব্রহ্মচারী যদি বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে সে গৃহস্থ আশ্রম বরণ করতে পারে। কিন্তু কোনো দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি যদি মনে করে যে, বিবাহের মাধ্যমে সে তার যৌন কামনাকে দমন করবে, তবে তার সেই আশা অবাস্তব। আর স্ত্রী কখনই পুরুষের কামবাসনা পরিতৃপ্ত করার যন্ত্র নয়।

বিবাহবন্ধনকে এক পরম পবিত্র বন্ধন বলে গ্রহণ করতে হবে। যারা কামবাসনাকে দমন করার উদ্দেশ্য নিয়ে বিবাহ করে, তাদের অঙ্ক ভুল। কাম উপভোগের মাধ্যমে কখনই কামকে দমন করা যায় না। পেট্রোল দিয়ে কি আগুন নেভানো যায়? অতিরিক্ত কাম উপভোগকে আগুনের মধ্যে অতিরিক্ত পেট্রোল ঢালার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে, কামকে দমন করতে হলে আমাদেরকে বিশেষত বিগ্রহ অর্চনের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। নববিধা ভক্তির মধ্যে বিশেষ করে অতি প্রেমসহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথা মদনমোহন

এবং মদনমোহন-মোহিনীর (শ্রীরাধা) শ্রীবিগ্রহের অর্চন করতে হবে। বিগ্রহকে নিয়মিত বিধিমতে স্নান করানো, সাজানো (শৃঙ্গার), ভোগ নিবেদন এবং শয়ন ইত্যাদি নানা সেবার মাধ্যমে শ্রীবিগ্রহের প্রতি আমাদের প্রেমকে গাঢ় করে তুলতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্তনও নিয়মিত করতে হবে। তাহলে খুব শীঘ্রই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের গন্ধ আস্বাদন করা সম্ভব।

পরমহংস গৃহস্থ

কৃষ্ণপাদপদ্মগন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মালোক আদি সুখ তারে নাহি ভায়॥

যিনি পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মগন্ধ লাভ করেছেন, ব্রহ্মালোকের দুষ্প্রাপ্য সুখও তাঁর কাছে বিষবৎ, ব্রহ্মসুখ নরকের মতো, আর যৌনসুখ তো পচা মলমূত্র ছাড়া কিছুই নয়।

শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সর্বশক্তিমান, জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী অসুরেরাও তাঁর কাছে খেলার পুতুল মাত্র। তাই Mr Lust অর্থাৎ শ্রীযুক্ত মদনবাবু (যৌনবাসনা) কিংবা তার বাবা, কিংবা তার ঠাকুরদা যত বড় শক্তিশালী অসুরই হোক না কেন, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মগন্ধ লাভ করেছেন যে ভক্ত, তাঁকে চুল পরিমাণ বিচলিত করার শক্তিও তার নেই।

তাই, একমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃত দিয়েই মদনবাবুকে ঘায়েল করতে হবে, ভোগের পেট্রোল দিয়ে নয়। তা হলে বিবাহ কি নিষিদ্ধ? না, তাও নয়।

সাধারণত মেয়েরা ভাল স্বামী, ভাল গৃহ, সন্তান-সন্ততি আকাঙ্ক্ষা করে। এটা তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা। তাই কোনো ব্রহ্মচারী ভক্ত যদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালনে অক্ষমতা বোধ করেন, তাহলে শাস্ত্রসম্মতভাবে

গৃহস্থ আশ্রম বরণ করে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলেই কৃষ্ণভাবনা প্রচার করতে পারেন এবং কৃষ্ণভক্ত সন্তান উৎপন্ন করতে পারেন। তাঁদের সংযত জীবন সমাজের অসংখ্য ভণ্ড গৃহস্থ তথা গৃহমেধীদের কাছে এক শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

গৃহস্থ আশ্রমের সুউচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই বিবাহের উদ্দেশ্য। তাই গৃহস্থকে ক্রমে ক্রমে পরমহংস গৃহস্থে পরিণত হতে হবে। যিনি পরমহংস গৃহস্থ, তিনি ভক্তিরসামৃত আস্বাদন করে পাগল হয়েছেন, তাই স্ত্রীর সঙ্গে থাকলেও তিনি স্বাভাবিকভাবেই অবিচলিত। কারণ তাঁর বৈরাগ্য কখনই শুষ্ক বৈরাগ্য নয়। তবে দিব্য আনন্দ আস্বাদন না করে, পরমহংস গৃহস্থের অভিনয় করাও উচিত নয়। প্রতিটি গৃহস্থেরই পরম কর্তব্য হল যত শীঘ্র সম্ভব সেই পরমহংস স্তরে উন্নীত হওয়া।

বিবাহের বয়স

বিবাহের মাধ্যমে গৃহস্থ আশ্রমকে বরণ করাই কামকে দমন করার পন্থা নয়। তা যদি হত, তাহলে প্রতিটি বিবাহিত মানুষই এক-একজন মহাপুরুষ হয়ে যেতেন।

প্রতিটি ব্রহ্মচারীকেই এই বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ১৬ বছর থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালনে অক্ষম ব্রহ্মচারীরা গৃহস্থ আশ্রম বরণ করতে পারে। বড় জোর ৩০ বছর বয়সের মধ্যেই বিবাহে ইচ্ছুক ব্রহ্মচারীদের বিবাহকার্য সম্পন্ন করতে হবে। ৩০ বছর বয়সের পরে বিবাহ খুব প্রীতিকর ঘটনা নয়। আজকাল অনেকে ৪০ বছর বয়সেও বিবাহ করে। বিদেশে অনেকে ৭০ বছর বয়সেও বিবাহ করে। এগুলি অবাঞ্ছনীয় দৃষ্টান্ত।

১৬ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যেই Mr. Lust বা মদনবাবুর জ্বালাতন সবচেয়ে বেশি হয়। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা যিনি কাটিয়ে

উঠেছেন, তাঁর পক্ষে বিবাহ না-করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ৩০ বছর বয়সের পর থেকেই শরীরে ভাটা নামতে থাকে। বোকা লোকেরা গলার জোরে সেই ভাটাকে অস্বীকার করে তরতাজা যুবক-যুবতীদের অনুকরণ করার চেষ্টা করে। এইভাবে সেই ভাটাকে তারা শুধু আরও ত্বরান্বিতই করতে পারে।

এই ভাটাকে যারাই অস্বীকার করবে, দুরারোগ্য ব্যাধি তাদের অনিবার্য। কিছু কিছু প্রতারক মোটা টাকার লোভে ওষুধপত্র দিয়ে সেই ভাটাকে রোধ করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দান করে। কিন্তু যাঁরা প্রতারিত হতে চান না, তাঁরা জানেন, ৩০ বছর বয়সের পর জোয়ারের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তখন থেকে যে ভাটা শুরু হবে, মৃত্যুই তার পূর্ণচ্ছেদ। এ ছাড়া ৩০ বছর বয়সের পর বিবাহিত ব্যক্তি যথাসময়ে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস নিতেও অক্ষম হবেন এবং তাঁকে বহু বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

যাঁরা দু'টানায় আছেন

প্রয়োজনে অক্ষম ব্রহ্মচারী এমনকি ১৬-১৭ বছর বয়সেও বিবাহ করতে পারে। যিনি দু'টানায় আছেন, তাঁকে তাঁর ২৫ বছর বয়সের মধ্যেই যে-কোনো একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যাঁরা দু'টানায় আছেন, তাঁদের প্রথম কর্তব্য হল ভাল দিকটায় মনোনিবেশ করা। অর্থাৎ মদনমোহন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং মদনমোহনমোহিনী শ্রীমতী রাধারানীর শ্রীবিগ্রহ অর্চনের মাধ্যমে, কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্তন, আকুল প্রাণে প্রার্থনা—ইত্যাদি চিন্ময় পন্থার মাধ্যমে মদন রিপুকে দমন করার চেষ্টা করতে হবে। যখনই মনের মধ্যে কামচিন্তা জাগ্রত হওয়ার পূর্বাভাস নজরে আসবে, মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের কাছে আকুল প্রাণে প্রার্থনা করতে হবে। নিঃসন্দেহে তিনি তৎক্ষণাৎ সাহায্য করবেন। শুধু পূর্বাভাসের জন্যও অপেক্ষা করা ঠিক নয়। সব সময়ই আমাদের প্রার্থনা চালিয়ে যেতে হবে। সর্বদাই নববিধা ভক্তির অনুশীলন করতে হবে।

সব কাজই প্রথমদিকে কঠিন বলে মনে হয়। প্রথম দিকে জোর করেই ইন্দ্রিয়কে দমন করতে হবে। জোর করেই ওষুধ গ্রহণ করতে হবে। জোর করে ইন্দ্রিয়কে, বিশেষ করে কাম বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ না করলে শ্রবণ কীর্তনেও স্বাদ পাব না। যদি সত্যি সত্যিই আমরা কৃষ্ণভাবনার কল্পনাতীত অমৃত-আস্বাদন লাভ করতে চাই, প্রথম দিকে জোর করেই আমাদের চারটি নিয়ম পালন করতে হবে। তাহলেই ক্রমে ক্রমে দিব্য রসের আস্বাদন হবে। আর দিব্য রসের আস্বাদন হলে মদন রিপু Mr. Lust-কে হত্যা করা খুবই সহজ।

অবশ্য চিরকালই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কেননা রাজপথেও দুর্ঘটনা ঘটে। কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, মদনবাবুকে পরাভূত করার এই একটাই পন্থা। ভক্তিযোগরূপ চিন্ময় পন্থাকে অবলম্বন না করলে বিবাহরূপ জড় পন্থায় কোনও দিনও মদনবাবুকে পরাভূত করা যাবে না।

গৃহস্থের স্বাধীনতা

কোনো ব্যক্তি যখন সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি স্বাধীনভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করতে সক্ষম। যেমন একজন সন্ন্যাসীর কোনো পারিবারিক বন্ধন নেই, তাই তিনি অতি সহজেই পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করতে পারেন। কোনও গৃহস্থের পক্ষে কি সেই রকম স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব?

স্ত্রী যদি উন্নত ভক্ত হন, তাহলে তাঁকে বন্ধন বলে গণ্য করা ভুল। স্বামী এবং স্ত্রী—দুজনেই যখন কৃষ্ণভাবনামৃতে উন্নতি লাভ করেন, তখন তাঁরাও সন্ন্যাসীর মতোই স্বাধীনভাবে সমগ্র বিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করতে সক্ষম। ইসকনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসকনের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অসংখ্য গৃহস্থ ভক্ত সমস্ত বিশ্ব জুড়ে প্রচার করে চলেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ

তাঁর গৃহস্থ শিষ্যদেরও দেশ-দেশান্তরে পাঠিয়েছেন নতুন মন্দির স্থাপন করার জন্য। যেমন, লন্ডনে মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমেরিকা থেকে যে কয়জন ভক্তকে শ্রীল প্রভুপাদ সেখানে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন গৃহস্থ। বহু মন্দিরে বহু গৃহস্থ ভক্ত মন্দির অধ্যক্ষরূপে, এমনকি জি.বি.সি. এবং গুরুরূপেও কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করে চলেছেন এবং এই ব্যাপারে তাঁদের সাফল্যও অভূতপূর্ব এবং তুলনাবিহীন। সুতরাং যে গৃহস্থের চেতনা বন্ধনমুক্ত, সেই ধরনের উন্নত গৃহস্থ ভক্তেরা সন্ন্যাসীর থেকে কম স্বাধীন নয়।

তবে কোনও পরিবারে যদি দেখা যায় যে, সেখানে স্বামী ভক্ত হলেও স্ত্রী বা সন্তানেরা ভক্ত নয়, কিংবা তার বিপরীত, সেক্ষেত্রেও শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে। কেননা এই জগতের কোনো বন্ধনই কৃষ্ণভক্তিকে তথা কৃষ্ণভক্তকে প্রতিহত করতে পারে না। তবে স্বাধীনতার নাম করে পারিবারিক দায়িত্বকে অস্বীকার করাও গৃহস্থের অন্যায়। একজন উন্নত কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থ তাঁর পারিবারিক দায়িত্ব পালন করেও অপ্রতিহত গতিতে কৃষ্ণভাবনাময় স্বাধীনতা আস্বাদন করতে পারেন। তবে এটা কেবল দক্ষ বৈষ্ণবের পক্ষেই সম্ভব কৃষ্ণভাবনায় যারা দুর্বল, তাদের পক্ষে নয়।

অবাঞ্ছিত হতাশা

যতদিন আমরা এই জড়জগতে জড়দেহের বন্ধনে আবদ্ধ, শুদ্ধ ভক্ত না হওয়া পর্যন্ত কম-বেশি যৌনকামনা আমাদের মধ্যে জাগ্রত হবেই। এই জড়জগতে এটা খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুতরাং যৌনকামনা আছে বলেই আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নয়। আমরা যেন মিছামিছি অতিরিক্ত হতাশ হয়ে কোনো অবস্থাতেই শ্রবণ-কীর্তন বন্ধ না করি।

অভদ্র ব্যক্তির কাজই হল জ্বালাতন করা। Mr. Lust বা মদনবাবু তেমনি এক মহা অভদ্র ব্যক্তি। তাঁর কাজই হল জ্বালাতন করা। কিন্তু ভদ্রলোক সমস্ত জ্বালাতনের মধ্যেও তাঁর কর্তব্যকর্মে অটল থাকেন।

এই মনুষ্য জন্মে আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হল কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্তনরূপ নববিধা ভক্তির তীব্র অনুশীলন করা (তীব্রেণ ভক্তিযোগেন)। অবশ্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি মাঝে মধ্যে যৌনকামনা প্রবল হয়ে ওঠে, তার জন্য নিশ্চয়ই আন্তরিকভাবে দুঃখিত হতে হবে।

তবে শুদ্ধ ভক্ত না হওয়া পর্যন্ত কম বেশি যৌনকামনা যখন থাকবেই, তা নিয়ে অযথা হা-হুতাশ করাও কৃষ্ণচিন্তার প্রতিবন্ধক হতে পারে।

দেহবদ্ধ অবস্থায় যৌনকামনা কোনও চিরস্থায়ী অযোগ্যতা নয়। অবশ্য সর্বদাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে যৌনবিষয়ক কৃত্রিম সুখে আমরা উৎসাহী না হই।

সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণের চরণকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। হরিদাস ঠাকুরের মতো মহান ভক্ত, যিনি রাত্রিবেলায় নির্জনে স্বয়ং মায়াদেবীর প্রলোভনের সামনেও ধীর ছিলেন, তাঁর কৃপা ভিক্ষা করতে হবে।

অনেকের ক্ষেত্রে বিবাহও যথেষ্ট সুফল দান করে। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বদ অভ্যাস থাকতে পারে। কিন্তু তাতে নিরুৎসাহিত না হয়ে, অযথা হা হুতাশ করে সময় নষ্ট না করে, গৃহস্থ আশ্রম বরণ করে তীব্রভাবে নববিধা ভক্তির অনুশীলন করাই এই সমস্যার সমাধান।

অবশ্য যাঁরা সক্ষম, তাঁরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী থেকেই নববিধা ভক্তির অনুশীলন করবেন। তাঁরা উত্তম। কার্যক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান গৃহস্থও সেরকম উত্তম হতে পারেন। উচ্চস্বরে, একাগ্র চিত্তে সংখ্যানাম জপ করতে হবে। শ্রবণ, কীর্তন, বিগ্রহ অর্চন যত নিষ্ঠাযুক্ত হবে, ততই আমরা সেই অভদ্র ব্যক্তিটির জ্বালাতন থেকে ক্রমে ক্রমে মুক্ত হব।

দৃষ্টান্ত স্থাপন

গৃহস্থ জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল আদর্শ গৃহস্থ জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। জগতের অসংখ্য নারী-পুরুষ উচ্ছৃঙ্খলভাবে গৃহমেধী জীবন যাপন করছে। তার ফলস্বরূপ তাদের জীবন হয়ে উঠেছে কৃষ্ণচেতনাবিহীন এবং বিষময়।

কোন শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত যখন বিবাহিত জীবনে থেকেও শান্তিপূর্ণভাবে এবং সুস্থভাবে জীবন যাপন করেন, তখন তা বদ্ধ পাগলস্বরূপ গৃহমেধীদের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং তা সকলকেই অনুপ্রাণিত করে।

সেই সমস্ত কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থেরা যথাসম্ভব কৃষ্ণভক্ত সন্তান উৎপাদন করে তাদের কৃষ্ণভক্তিমূলক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তুলতে পারেন। সমাজে অবাঞ্ছিত আসুরিক কুশিক্ষা প্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সমাজকে এদের মারাত্মক প্রভাব থেকে বাঁচাতে হলে প্রচুর সংখ্যক শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থেরা দায়িত্ব সহকারে যত বেশি কৃষ্ণভক্ত সন্তান উৎপাদন করবেন এবং তাদের সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন, জগৎবাসীও ততই বুঝতে পারবেন যে, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত সন্তানেরা কতো চমৎকারভাবে বিকশিত হতে পারে।

কর্মীরা দাম্পত্যজীবনে অহরহ ঝগড়াঝাঁটি, বিবাহ-বিচ্ছেদ, স্ত্রী-হত্যা এবং অগণিত অশান্তিমূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থেরা তার বিপরীত আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। তাহলেই এই গৃহস্থ আশ্রম হয়ে উঠবে সার্থক।

ব্রহ্মচর্য পালনের পক্ষে গৃহস্থ আশ্রম অনুকূল না হতে পারে। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করা নিঃসন্দেহে শ্রেয়। কিন্তু যিনি গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও, একজন সুন্দরী, প্রিয়ভাষিণী এবং অনুগতা স্ত্রীর উপস্থিতি সত্ত্বেও ব্রহ্মচর্য পালন করতে সক্ষম, তিনি ব্রহ্মচারীর থেকেও উন্নত স্তরে অবস্থান করছেন।

এ ছাড়া যিনি পরস্ত্রী-সঙ্গ করেন না, যিনি শুধুমাত্র যোগ্য কৃষ্ণভক্ত সন্তান কামনায় দায়িত্বজ্ঞান-সহ তাঁর নিজের স্ত্রীর সঙ্গ করেন, শাস্ত্রীয় বিচারে তিনিও ব্রহ্মচারী বলে পরিগণিত হন। এইরূপ গৃহস্থ ব্রহ্মচারীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই প্রকৃত গৃহস্থ আশ্রমীদের কর্তব্য।

গৃহমেধী জীবনের পরিণতি

গৃহস্থ আশ্রম ততক্ষণই আশ্রম, যতক্ষণ সেই আশ্রমের সদস্যরা বৈদিক নির্দেশ পালন করে চলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন,

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার ॥

যেখানে অনাচার, সেখানে আর আশ্রমিক পরিবেশ থাকে না। তখনই সেই তথাকথিত গৃহস্থ জীবন গৃহমেধী জীবনে পর্যবসিত হয়। যিনি নিষ্কপটভাবে যথার্থ গৃহস্থ জীবন-যাপনে ইচ্ছুক, তাঁকে এই গৃহমেধী জীবন সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে। গৃহস্থরা যাতে গৃহমেধী জীবনধারা সম্বন্ধে সতর্ক হতে পারে, সেজন্য শাস্ত্রে গৃহমেধীদেরও নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অত্যন্ত চমৎকারভাবে গৃহমেধীদের বর্ণনা করেছেন :

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতাম্ আত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্॥
(ভাগবত ২/১/২)

যারা গৃহমেধী, তারাও শ্রবণ করে। তবে তারা কখনো কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতে চায় না। তা বলে তাদের শ্রবণ করার বিষয়বস্তুর কোনই অভাব হয় না। হাজার হাজার গ্রাম্য কথা বলেও তাদের যেন কথা আর শেষ হয় না। এসব গ্রাম্য কথাকে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় প্রজল্প বলা হয়। গৃহমেধীদের কাছে এইসব প্রজল্প বা গ্রাম্যকথা অত্যন্ত মুখরোচক বোধ হয়। কে কোন্ দিন কী খেয়েছে, কার স্ত্রী কী রান্না করেছে ইত্যাদি

ইত্যাদি। আবার জড়জাগতিক সিনেমা, রাজনীতি, অর্থনীতি-বিজ্ঞান—এসব বিষয়ে কথা বলাও প্রজল্প। এক কথায় কৃষ্ণকথা ছাড়া অন্য সব কথাই, তা সে যতই মুখরোচক হোক না কেন, সবই প্রজল্প।

এই প্রজল্পের উৎস কি? সে সম্বন্ধে উপরোক্ত শ্লোকে বলা হল, 'অপশ্যতাম্ আত্মতত্ত্বম্' অর্থাৎ গৃহমেধীরা যেহেতু আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেনি, তাই গ্রাম্য কথায় তাদের এত আহ্লাদ। গ্রাম্য কথা বলে এবং শুনে, অট্টহাসি করে তারা মগ্ন থাকে বিষয় সুখে।

কিন্তু এই দুর্লভ মনুষ্য জীবনের অমূল্য সময় মুহূর্তের মধ্যে ফুরিয়ে যায়। কারণ, সময়ের গতি বড়ই তীব্র আর অপ্রতিরোধ্য—'গভীর রংহসা'। আর এই সুতীব্র গতিশীল সময় অতিক্রান্ত হয় সম্পূর্ণ নিঃশব্দে এবং অদৃশ্য চোরের মতো। এইভাবে মায়ার ভজনা করতে করতে গৃহমেধীরা মুহূর্তের মধ্যে ফতুর হয়ে যায়।

কিন্তু সেই অবস্থাটা বুঝতে না বুঝতেই সময় তার ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশ করে। সময়ের সেই ভয়ঙ্কর রূপকেই বলা হয় মৃত্যু বা কালরূপ—যা নাস্তিকতার দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের কাছে অনস্বীকার্য ভগবান। গৃহমেধীদের মধ্যে এই নাস্তিক-ভাবেরই প্রাধান্য। তাই, যদিও তারা আত্মতত্ত্ব দর্শন করতে বাধ্য নয়, কিন্তু গৃহমেধীদের কল্পনারও অতীত, ভগবানের এই মহা ভয়ঙ্কর, সর্বগ্রাসী মৃত্যুরূপ তথা কালরূপ দর্শন করতে তারা বাধ্য।

গৃহস্থের অর্থনীতি

গৃহস্থকে যথাসম্ভব বেশি পরিমাণে অর্থ উপার্জন করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে, কৃষি-গোপালনের মাধ্যমে—শাস্ত্রসম্মত বিভিন্ন পন্থায় তিনি সৎভাবে অর্থ উপার্জন করবেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর অনেক শিষ্যকে কোটিপতি হতে উৎসাহিত করেছেন।

প্রশ্ন হল, কৃষ্ণভাবনার পন্থা যেখানে সরল জীবন উচ্চভাবনা, সেখানে শ্রীল প্রভুপাদের মতো একজন শুদ্ধ ভক্ত কেন তাঁর গৃহস্থ শিষ্যদের কোটিপতি হতে উৎসাহিত করছেন? তার উত্তরও তিনি দিয়েছেন। গৃহস্থ তাঁর উপার্জিত অর্থের ৫০% কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য, শ্রীকৃষ্ণের মন্দির নির্মাণের জন্য তথা কৃষ্ণসেবার জন্য দান করবেন। অবশিষ্ট ৫০%-এর মধ্যে ২৫% তিনি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করবেন এবং বাকি ২৫%-এর সাহায্যে সংসারের দৈনন্দিন ব্যয়ভার বহন করবেন।

কোনও গৃহস্থ হয়তো ভাবতে পারেন, 'ঠিক আছে, আমি ৫০% শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যয় করব, তবে আমার নিজের বাড়িতেই আমি কৃষ্ণের জন্য ফ্রিজ কিনব, মন্দির করব, মঠে মন্দিরে দান করার কোনো দরকার নেই'।

এরকম ভাবনায় আত্মপ্রতারণার সম্ভাবনা রয়েছে। নিজের বাড়িতে কৃষ্ণসেবার দোহাই দিয়ে প্রকারান্তরে সমস্ত টাকাই কুটুম্বভরণে ব্যয় করা উচিত নয়। বরং কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে নিযুক্ত গুরুমহারাজকে কিংবা পরম্পরাভুক্ত কোন শুদ্ধ ভক্তকে সেই অর্থ দান করুন, কেননা তিনি সেই টাকাটা শুধু কৃষ্ণের জন্যই আরও নিখুঁতভাবে সেবায় লাগাবেন। পাশাপাশি কুটুম্ব ভরণের জন্য নির্ধারিত ২৫% টাকাটা দিয়ে আপনার ঘরেও শ্রীকৃষ্ণসেবা করতে পারেন।

এখন প্রশ্ন হল, যে সমস্ত গৃহস্থরা সব সময় কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের মন্দিরে থেকে কৃষ্ণসেবা করছেন, তাঁরা তো ব্যবসা-বাণিজ্য করার পর্যাপ্ত সময় পাবেন না। তাঁদের পক্ষে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে মন্দিরকে দান করা তো অনেক সময় সম্ভব হয় না, বরং তাঁদের ভরণ পোষণের জন্যও মন্দিরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়।

এই ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ হল, মঠবাসী গৃহস্থেরা যাঁরা সবসময় কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত, তাঁরা যেন যথাসম্ভব অল্পে সন্তুষ্ট থাকেন।

গুরুদেব বা তাঁর প্রতিনিধিগণ দেখেন যে, মঠবাসী গৃহস্থেরা যেন মন্দিরের অর্থে বিলাসবহুল জীবন যাপন না করেন। পাশাপাশি গৃহস্থের বাস্তবিক প্রয়োজনকেও তাঁরা উপেক্ষা করেন না। তাই মঠবাসী গৃহস্থগণের কর্তব্য হল কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় শ্রদ্ধা রেখে অল্পেই সন্তুষ্ট থাকা। অবশ্য যে সমস্ত গৃহস্থ পরমহংস স্তরে উন্নীত হয়েছেন, সর্বদাই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করে থাকেন।

পত্নী নির্বাচন

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র একবার বলেছিলেন—*দেশে দেশে কলত্রানি*—অর্থাৎ সব দেশেই স্ত্রী পাওয়া যায়। অথচ কার্যক্ষেত্রে রামচন্দ্র শুধুমাত্র সীতাদেবীকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

একজন যোগ্য পুরুষের কখনও পত্নীর অভাব হয় না। তিনি আমেরিকাতেই যান আর চীনেই যান, যে কোনো দেশেই তিনি বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু সমস্যা হল, নষ্ট পত্নী কিংবা ভোগাসক্ত পত্নী সংসার জীবনে সর্বদাই আগুন জ্বালিয়ে রাখে।'

বহু পুরুষ নারীর দৈহিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে মুহূর্তের মধ্যে পত্নী নির্বাচন করেন এবং তার ফলস্বরূপ সারা জীবন জ্বলেপুড়ে মরেন। সুতরাং দেশে দেশে স্ত্রী পাওয়া গেলেও বুদ্ধিমান পুরুষ কখনও স্বার্থপর এবং ভোগাসক্ত কোনও পত্নীকে গ্রহণ করেন না।

এই জগতে সর্বোত্তম পত্নী হলেন তিনিই যিনি শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত। অবশ্য সেরকম পত্নী লাভ করতে হলে স্বামীকেও শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হতে হবে। যিনি কোনও উন্নত কৃষ্ণভক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করেন, তিনি অত্যন্ত আনন্দে সংসারজীবন যাপন করতে পারেন। সেরকম পত্নী একজনই যথেষ্ট।

অপর পক্ষে, ভোগাসক্ত বহু পত্নী স্বামীর জীবনে শুধু নারকীয় যন্ত্রণাই সৃষ্টি করতে পারে। বহুবিবাহ যদিও শাস্ত্রসম্মত, যিনি কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে নিষ্ঠাবান, তিনি কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা এক পত্নী নিয়েই সন্তুষ্ট।

পত্নীর বয়স স্বামীর থেকে অবশ্যই কম হবে। স্ত্রী তাঁর স্বামী থেকে বয়সে ১০ বছর ছোট হলেও চলে, তবে তার বেশি যেন না হয়।

যে স্ত্রী কৃষ্ণভক্ত, অন্যান্য গুণাবলী তাঁর মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবেই জাগ্রত হবে। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে স্বভাবগত সামঞ্জস্য বাঞ্ছনীয়। এজন্য যথার্থভাবে কুষ্ঠি বিচার করারও প্রয়োজন রয়েছে।

গ্রাম্য দেহাসক্তির বশবর্তী পুরুষেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পত্নী নির্বাচনে ভুল করে। সেক্ষেত্রে শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুজনেরা, যদি তাঁরা কৃষ্ণভক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁরাই, বিশেষত পিতামাতা তাঁদের পুত্রের উপযুক্ত পত্নী নির্বাচন করে দিতে পারেন। স্ত্রীর পক্ষে স্বামী নির্বাচনেও একই কথা প্রযোজ্য।

নিত্য গার্হস্থ্য

আমাদের শ্রীকৃষ্ণও এক পরম মহান গৃহস্থের ভূমিকায় লীলাবিলাস করছেন। শ্রীকৃষ্ণ কখনই নিঃসঙ্গ ভিক্ষুক নন। আর আমাদের জীবনেরও উচ্চাকাঙ্ক্ষা হল শ্রীকৃষ্ণের সেই চিন্ময় গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গ লাভ করা। একমাত্র শুদ্ধ ভক্তেরাই শ্রীকৃষ্ণের সেই নিত্য পরিবার জীবনে প্রবেশ করার অধিকার পান। কৃষ্ণের পরিবারে অংশ নিতে ইচ্ছুক ভক্ত এই জগতের গৃহস্থই হোন আর সন্ন্যাসীই হোন—দুজনকেই সমানভাবে শুদ্ধ হতে হবে।

এই জগতে, ভক্তের অবস্থা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ কখনও কখনও কাউকে গৃহস্থ হওয়ার সুযোগ দেন, আবার কাউকে গৃহস্থ হতে বাধাও দেন। তিনি জানেন, কোন্ আশ্রম কার উপযুক্ত। তাই গৃহস্থ হতে অভিলাষী ভক্ত যদি বাধাপ্রাপ্ত হন, তা হলে সেটাকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বলেই গ্রহণ করতে হবে। ভাবতে হবে, 'হয়তো শ্রীকৃষ্ণ চান, আমি যেন ব্রহ্মচারী হয়েই থাকি।'

তবে যিনি মনের মধ্যে উত্তেজনা বোধ করছেন, তাঁর বিবাহ করাই বাঞ্ছনীয়। আবার সেই উত্তেজনার মাত্রা যেহেতু সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, প্রত্যেক ভক্তকে তাই স্বতন্ত্রভাবেই বিবাহ করা বা না-করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরামর্শ অনুসারে, এই কলিযুগে অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষেই গৃহস্থ আশ্রম অবলম্বন করে কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন করাই শ্রেয়। তবে ব্যক্তিগত বৈষম্য অনুসারে কোনও কোনও ভক্ত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী হয়েও থাকতে পারেন। অবশ্য কলিযুগে তাদের সংখ্যা খুবই কম।

তবে ইহজগতে আমরা গৃহস্থই হই আর ব্রহ্মচারী কিংবা সন্ন্যাসীই হই না কেন—এ কথা সকলের পক্ষেই একশ ভাগ সত্য যে, যিনি অবিশ্রান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত থাকেন, তার মনে যৌন উত্তেজনা খুব একটা বাহাদুরি দেখাতে পারে না। ইহজগতের ব্যক্তিগত বৈষম্য অনুসারে আমরা যে আশ্রমই বরণ করি না কেন, আমাদের প্রত্যেককেই অবিশ্রান্তভাবে কৃষ্ণভাবনায় অবশ্যই ভাবিত হতে হবে। তা হলেই আমাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিবার জীবনে প্রবেশের অধিকার লাভ করা সম্ভব। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীরাও শ্রীকৃষ্ণের সেই নিত্য গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন।

মিথ্যাচারী

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে কেউ যদি বাইরে সংযমী ব্যক্তির মতো আচরণ করে অথচ ভেতরে ভোগের বিষয়সমূহ চিন্তা করে, তা হলে সে একজন মিথ্যাচারী অর্থাৎ ভণ্ড।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "আমরা কোনও ভণ্ড শিষ্য গ্রহণ করে আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাই না, বরং আমরা শুধু একজন আন্তরিক এবং নিষ্কপট ব্যক্তিকে চাইছি।"

সকলের প্রতি তাঁর খোলাখুলি নির্দেশ হল এই যে, কেউ যদি ব্রহ্মচারী থাকতে পারেন, তা হলে তা অত্যন্ত চমৎকার—তবে কৃত্রিম ব্রহ্মচারী হয়ে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। একজন ধর্মপত্নী গ্রহণ করে, মানসিক উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করতে কোনও ক্ষতি নেই। অবশ্য দেখতে হবে যেন তাতে আমরা ভণ্ডামি থেকে মুক্ত হয়ে, আন্তরিক এবং নিষ্কপট নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃতে অগ্রগতি লাভ করি।

বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত—সেটা আমাদের সমস্যা নয়। যদি দেখা যায় ব্রহ্মচারী থেকে কোনও ব্যক্তি যতটুকু কৃষ্ণসেবা করতে পারছেন, বিবাহিত হলে তিনি আরও উৎকৃষ্টতরভাবে এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে কৃষ্ণসেবা করতে সক্ষম হবেন, তা হলে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই গৃহস্থ আশ্রম বরণ করতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের নীতি।

শ্রীল প্রভুপাদের বহু গৃহস্থ শিষ্যই অত্যন্ত চমৎকারভাবে এই কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার যজ্ঞকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে ত্বরান্বিত করেছেন এবং আজও করে চলেছেন। তাঁরা এক-এক জন নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীর মতোই আন্তরিক। সুতরাং আশ্রমিক পার্থক্য একটি বাহ্য ব্যাপার মাত্র। উদ্দেশ্য হচ্ছে মিথ্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে নিষ্কপটভাবে এবং আন্তরিকভাবে হরিভজন করা।

দিল্লীকা লাড্ডু

দিল্লীকা লাড্ডু—যো খায়া ও পস্তায়া, যো নেহি খায়া ওভী পস্তায়া। অনেক সময় অবিবাহিত ব্যক্তিরা ভাবেন, বিবাহিত জীবনে না জানি কত সুখ। কিন্তু বুদ্ধিমান গৃহস্থমাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন যে, এই বিবাহিত জীবনে দুঃখের কোনো শেষ নেই।

বিশেষত এই কলিযুগে মেয়েরা বিন্দুমাত্রও স্বামীর অনুগত হতে চায় না, আর ছেলেরা হয় খুব বদরাগী। মাঝে মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া এতই

মারাত্মক হয়ে ওঠে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। সময় সময় স্ত্রীও স্বামীকে মেরে ফেলে। আর বিবাহ-বিচ্ছেদ তো হামেশাই হচ্ছে। কিংবা অবৈধ যৌনসঙ্গের ফলস্বরূপ পারিবারিক অশান্তি এবং আত্মহত্যার ঘটনাও আজকাল বিরল নয়।

মনে হতে পারে, অভক্ত স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে এরকম অশান্তি স্বাভাবিক। ভক্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরকম ঝগড়াঝাঁটি হয় না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি শুদ্ধ ভক্ত না হন, এই দাম্পত্য কলহ যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন পরিবারেই অশান্তির বিষ ছড়াতে পারে।

তবে ভক্ত গৃহস্থ জানেন, স্বামী-স্ত্রীর এই ঝগড়াকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। বৈদিক দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রথমতঃ যথাসম্ভব এই দাম্পত্য কলহ পরিহার করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ যদিও বা মাঝে মাঝে দাম্পত্য কলহ ঘটেও যায়, একে খুব গুরুত্ব দেওয়া চলবে না। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াকে দুটো শিশুর ঝগড়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়। বুদ্ধিমান স্বামী এবং বুদ্ধিমতী স্ত্রী তাই কখনই একে গুরুত্ব দেন না।

চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন যে, দুটো ছাগলের যুদ্ধ, ঋষির শ্রাদ্ধ, প্রভাতে মেঘের গর্জন এবং স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াতে শুধু বাহ্য আড়ম্বরই বেশি, কার্যক্ষেত্রে কিছুই হয় না। তিনি আরও বলেন যে, যেখানে মূর্খদের পূজা হয় না, ধান চাল সঞ্চিত থাকে এবং দাম্পত্য কলহ নেই—সেখানে লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং আসেন।

তাই ভক্ত গৃহস্থেরা যথাসম্ভব এই দাম্পত্য কলহকে এড়িয়ে চলেন কিংবা তাকে আদৌ গুরুত্ব দেন না। কিন্তু বিবাহের পূর্বেই প্রত্যেককে জেনে রাখা উচিত যে, দাম্পত্য জীবনে বিচিত্র রকমের অশান্তি প্রায় অনিবার্য। ভাগ্যবান ব্রহ্মচারীরা তাই এই অন্ধকূপে কখনই পদার্পণ করতে চান না।

ভণ্ডামি নিষ্প্রয়োজন

নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই আধ্যাত্মিক প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয় না, তবে ভোগের বাসনা নিয়ে নারীকে দর্শন করাই হচ্ছে পারমার্থিক জীবনের পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ।

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, বিষয় ভোগের প্রতি আসক্তি পারমার্থিক প্রগতির পক্ষে আদৌ উপযোগী নয়। তবে বর্তমান সময়ে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশে নারী পুরুষ অবাধে মেলামেশা করছে এবং এর ফলস্বরূপ কখনও কখনও স্বভাবতই মন উত্তেজিত হয়। সুতরাং আমাদের কিছু পূর্ব সতর্কতা নিতে হবে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ব সতর্কতা হচ্ছে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনার স্তরে উন্নীত হওয়া।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, কাঠের নির্মিত নারীমূর্তি দর্শন করেও তাঁর মন উত্তেজিত হয়। অবশ্য মহাপ্রভু এই কথার মাধ্যমে আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে, যেখানে কাঠের নারীমূর্তি উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে, সেক্ষেত্রে প্রকৃত নারী দর্শন করা কতই না মোহজনক, বিশেষতঃ এই যুগে আমাদের মতো অধঃপতিত মানুষদের পক্ষে। নারী দর্শনে এই উত্তেজনা খুবই স্বাভাবিক। তবে কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নত আস্বাদ লাভ করার মাধ্যমে, কৃষ্ণভাবনায় প্রগতি সাধনের মাধ্যমে এই উত্তেজনাকে রোধ করা যায়।

কিন্তু তাকে রোধ করা যদি একেবারেই কঠিন হয়ে পড়ে, তা হলে গৃহস্থ আশ্রমকে বরণ করে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করতে হবে। এইভাবে যৌন-উত্তেজনা প্রশমিত হবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন সম্ভব হবে।

কেউ যদি যৌনজীবনকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেন এবং তাঁর আসক্তিকে কৃষ্ণমুখী করে তুলতে সক্ষম হন, তা হলে তাঁর অবস্থা

অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু যিনি সেই স্তরে উন্নীত হতে আপাতত অক্ষম, তাঁর পক্ষে কৃত্রিমভাবে ত্যাগের অভিনয় তথা ভণ্ডামি করার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং গৃহস্থ হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করাই শ্রেয়।

নিঃস্বার্থ কৃষ্ণসেবাই লক্ষ্য

যৌন কামনাকে দমন করতে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য এই বিবাহ হচ্ছে এক প্রকার আপোষ মীমাংসা এবং ছাড়পত্রবিশেষ। তবে কৃত্রিম ব্রহ্মচর্যের মিথ্যাচারকে বন্ধ করার জন্য এর ব্যাপক প্রয়োজনও রয়েছে। অবশ্য কেউ যদি শুদ্ধভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করতে সক্ষম হয়, তাকে জোর করে গৃহস্থ করা যায় না এবং গৃহস্থ হওয়ার জন্য তাকে উৎসাহিত করাও উচিত নয়।

কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর বয়সে প্রত্যেকেরই উচিত স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সর্বতোভাবে কৃষ্ণসেবায় মনোনিবেশ করা। গৃহস্থ মানে এই নয় যে, আজীবন স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে হবে। সাধারণত ২৫ বছর বয়সে বিবাহিত হয়ে বড় জোর ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত—অর্থাৎ মোট ২৫ বছরের পর কঠোরভাবে যৌন জীবন থেকে বিরতি গ্রহণ করতে হবে।

আর ৬৫ থেকে ৭০ বছর বয়সের মধ্যে প্রত্যেককেই কার্যত সন্ন্যাস নিতেই হবে। অর্থাৎ সন্ন্যাস বেশ ধারণ না করলেও কাজের মাধ্যমে তাকে সন্ন্যাসীর মতো অবশ্যই হতে হবে। কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে নিঃস্বার্থ কৃষ্ণসেবা করা। সেটিই প্রকৃত সন্ন্যাস। আমরা যদি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কৃষ্ণসেবা করতে পারি, তা হলে সর্ব অবস্থাতেই সকলেই সন্ন্যাসী বলে পরিগণিত হবে।

গীতায় বলা হয়েছে যে, যিনি নিঃস্বার্থভাবে কৃষ্ণসেবা করছেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং যোগী (*গীঃ ৬/১*)। সুতরাং সকল বর্ণ এবং

আশ্রমের মানুষেরই কর্তব্য হল, নিঃস্বার্থভাবে কৃষ্ণসেবা করার প্রকৃত সন্ন্যাস গ্রহণ করা।

বিবাহের মানসিক প্রস্তুতি

কৃষ্ণভাবনামৃতে কৃত্রিমভাবে জবরদস্তি করে কামনা-বাসনাকে বন্ধ করা হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *'ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কাম হস্মি ভরতর্ষভ'*—'ধর্মের অবিরোধী কামরূপে আমি প্রাণিগণের মধ্যে বিরাজমান'। সুতরাং যিনি উপস্থবেগকে অতিক্রম করতে অক্ষম, তিনি অবশ্যই গৃহস্থ আশ্রমকে বরণ করবেন। কিন্তু বিবাহের পূর্বেই তাঁকে ভাবতে হবে যে, এই বিবাহের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণসেবা বৃদ্ধি করা।

শ্রীল প্রভুপাদ দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতেন, 'আমার গুরুমহারাজ তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে নিযুক্ত করেছিলেন। আমি আমার গৃহস্থ শিষ্যদের প্রচারে পাঠাচ্ছি এবং তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী কী চমৎকার প্রচার করছে!' অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি গৃহস্থ হয়েও মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতে পারেন, তা হলেই তাঁর গৃহস্থ হওয়া সার্থক। এবং এই কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারই হল গৃহস্থ আশ্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

তাই বিবাহের পূর্বেই ভাবতে হবে, যিনি বিবাহ করতে ইচ্ছুক, তিনি গৃহস্থ আশ্রমের সমস্ত প্রকার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম কি না। মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাঁকে আগে থেকেই বুঝতে হবে, বিবাহ কোনও ছেলেখেলা নয়। কুকুর-কুকুরীর মিলন নয়। এটি খুবই গুরুতর ব্যাপার। কুকুর-কুকুরীর মতো যখন-তখন বিচ্ছেদ চলবে না। একবার যিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, খামখেয়ালি মতো বিবাহ-বিচ্ছেদের কোনো প্রশ্নই সেখানে উঠতে পারে না। বিবাহের আগেই পাত্র-পাত্রীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে—'বিবাহের পর আমরা

পরস্পরকে ত্যাগ করব না'। না হলে শ্রীল প্রভুপাদ বিবাহের অনুমতি দিতেন না। এই বিবাহ-বিচ্ছেদ নাস্তিকদের মধ্যে এক মহা সমস্যা। এমনকি যারা ভক্তিমার্গে উন্নত নয়, তারাও এই সমস্যার কবলে পড়তে পারে। তাই শ্রীল প্রভুপাদ এ ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন। যাঁরা মানসিকভাবে যথেষ্ট প্রস্তুত নন, গৃহস্থ আশ্রমের ভাবী গুরুদায়িত্ব গ্রহণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নন, তিনি তাঁদের বিবাহ অনুমোদন করতেন না। অপর পক্ষে যাঁরা গৃহস্থ আশ্রমের গুরুদায়িত্ব পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁদের বিবাহ অনুমোদন করতেন এবং তাঁদেরকে সর্বতোভাবে আশীর্বাদ করতেন।

বিবাহ-বিচ্ছেদ অবৈদিক

কৃষ্ণভাবনাময় বিবাহে বিবাহ-বিচ্ছেদ অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। শ্রীল প্রভুপাদ তাই একবার নিয়ম করেছিলেন যে, বিবাহে ইচ্ছুক ভক্তরা যেন বিবাহের আগেই একটি কাগজে লিখিতভাবে প্রতিজ্ঞা করেন যে, কোন অবস্থাতেই তাঁরা বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে দেবেন না (*প্রভুপাদ শিক্ষামৃত ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৬৫*)। সেই প্রতিজ্ঞা লিপিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই স্বাক্ষর করতে হবে। অবশ্য এই প্রতিজ্ঞাকে গুরুত্ব দিতে হবে। গুরুদেব, বৈষ্ণব, অগ্নি এবং বিগ্রহকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের বিধি বৈদিক শাস্ত্রেও রয়েছে। এই প্রতিজ্ঞা কোনো ছেলেখেলা নয়। এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলে মহা অপরাধ হয়।

কৃষ্ণভাবনায় যথেষ্ট বলিষ্ঠ না হলে, গৃহস্থ জীবনেও মায়া প্রবেশ করে জীবনকে অত্যন্ত দুঃখময় করে তুলবেই। তাই, কৃষ্ণভাবনামৃতে গৃহস্থকেও সন্ন্যাসীর মতোই দৃঢ়ব্রত হতে হবে এবং কেবল তা হলেই গৃহস্থ-জীবন সুখময় হতে পারে। অব্যর্থভাবে প্রতিদিন কমপক্ষে ১৬ মালা জপ করা, শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ পড়া, নগর সংকীর্তন এবং গ্রন্থ

বিতরণ ইত্যাদি সেবা করার মাধ্যমে কৃষ্ণসেবায় দৃঢ়ব্রত হওয়া যায়। যে গৃহস্থ কৃষ্ণসেবায় দৃঢ়ব্রত নয়, যে-কোনও মুহূর্তে সেই গৃহস্থের জীবনে অশান্তির বিষ নেমে আসবে।

শ্রীল প্রভুপাদ এই বিবাহকে এক প্রকার কনসেশন বা অতিরিক্ত সুযোগ কিংবা আপস নিষ্পত্তি বলেই গণ্য করতেন (*শিক্ষামৃত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৬৫*)। কেননা, ব্রহ্মচর্যই কৃষ্ণভাবনার পক্ষে উৎকৃষ্ট আশ্রম। ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে বীর্য সঞ্চিত হলে স্মৃতি প্রখর হয় এবং শ্রবণ কীর্তনাদি পন্থার যথার্থ ফল লাভ করা যায়। বর্তমানের বেশির ভাগ যুবক যুবতী কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনে অক্ষম বলেই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শিষ্যদের এই কনসেশন দিয়েছেন। সুতরাং এই কনসেশন বা আপস নিষ্পত্তিকে শোষণ করে তার অপব্যবহার করার থেকে অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে?

কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো বিবাহ-বিচ্ছেদ, গৃহস্থ আশ্রমের দায়িত্বকে অস্বীকার করা—এসব ঘটনা তো ছোটলোকের জীবনে হামেশাই হচ্ছে। বৈষ্ণবরাই হচ্ছেন জগতের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। কিন্তু আপনার ব্যবহারই আপনার পরিচয়। তাই ছোটলোক নয়, ভদ্রলোকের আচরণই বাঞ্ছনীয়।

দায়িত্বশীল গৃহস্থ

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে শ্রীল প্রভুপাদ যদিও খুব সহজেই বিবাহের অনুমোদন করতেন, শেষ দিকে তিনি একটু কঠোর হয়ে গিয়েছিলেন। যারা যথেষ্ট দায়িত্বশীল নয়, তিনি সহজে তাদের বিবাহ অনুমোদন করতেন না।

১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অমোঘ প্রভুকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেন যে, বাস্তবিকপক্ষে ইসকনের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠতম

পরিচালকেরা হচ্ছেন গৃহস্থ। কেননা পরিচালনা করার প্রতি গৃহস্থদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। তাই অমোঘ প্রভুর যদি সেরকম প্রবণতা থাকে, তাহলে তিনি বিবাহ করে সস্ত্রীক জাকার্তা নামক স্থানে একটি মন্দির খোলার দায়িত্ব নিতে পারেন।

সেই চিঠিতে প্রভুপাদ আরও বলেন যে, বিবাহের মুহূর্ত থেকে স্বামী হিসাবে তার স্ত্রীকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার পূর্ণ দায়িত্ব তাকে নিতে হবে। এই রক্ষা যেমন অর্থনৈতিক, তেমনি স্ত্রীকে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনামৃত দান করার দায়িত্বও স্বামীর। আর বিবাহ-বিচ্ছেদ যেন না হয়—এই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় বিবাহের প্রধান শর্ত। দায়িত্বশীলতার সঙ্গে যারা এই শর্ত পালন করতে সম্মত হবে, তারাই গৃহস্থ হওয়ার অনুমোদন পাবে। শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদাই তাদের আশীর্বাদ করবেন।

গৃহস্থ হওয়ার ঝুঁকি

সকলেই ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে পারেন। যাঁরা ততটুকু সমর্থ নন, তাঁরা বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু ভাবী গৃহস্থ যেন নিশ্চিতভাবে জেনে রাখেন যে, সামনে সমস্যাসঙ্কুল জীবন অপেক্ষা করছে। সর্বদাই একটা না একটা সমস্যা গৃহস্থ জীবনে লেগেই থাকবে—গৃহস্থ হওয়ার আগেই এটা নিশ্চিতরূপে প্রত্যাশা করা আবশ্যক। সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী আর সন্তান-সন্ততি—সকলেই দুঃখে জর্জরিত। তবুও গৃহমেধীরা কেবলই সন্তান উৎপাদন করে চলেছেন। কাম উপভোগ মানেই দুঃখ আর সমস্যা। তাই ধীর হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কামের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে অধীর হওয়া উচিত নয়।

এক সময় শ্রীল প্রভুপাদও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম দিকে অনেক সহজেই তিনি গৃহস্থ হওয়ার অনুমতি দিতেন এবং সেই সমস্ত গৃহস্থরা আশ্রমবাসী হয়েই প্রচার করতেন। প্রভুপাদ যখন দেখলেন যে,

কিছু কিছু গৃহস্থ আশ্রমের সেবা করার পরিবর্তে শুধু সমস্যারই সৃষ্টি করছে, তখন তিনিও অনেক কঠোর হয়ে ওঠেন। একটি চিঠিতে তিনি বলেন—

"এখন থেকে যারাই বিবাহ করার প্রস্তাব নিয়ে আসবে, তাদেরকে অবশ্যই বাইরে থেকে কিছু অর্থ উপার্জন করতে হবে। বিবাহের আগেই এ কথা জানা আবশ্যক। গৃহস্থ আশ্রমের সমস্ত বোঝা বহন করার জন্য তাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে। যারা বিবাহ করতে ইচ্ছুক, তারা তা করতে পারে, তবে এ ব্যাপারে সমস্ত ঝুঁকিই তাদের নিজেদেরকেই নিতে হবে। আমি আর অধিক অনুমোদন দিতে পারব না। আমার গুরুমহারাজ কখনই তা অনুমোদন করেননি। কিন্তু আমি যখন তোমাদের দেশে আসি, তখন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে আমি এই বাড়তি সুবিধাটুকু দিয়েছিলাম। আমারও আর অধিক অনুমতি দেওয়ার ইচ্ছা নেই। আমি অনুমোদন করব না। তবে গৃহস্থ আশ্রম যে সর্বদাই সমস্যাসঙ্কুল, এ কথা জেনে নিজের ঝুঁকিতে তারা বিবাহ করতে পারে।"

গৃহস্থের উপদ্রব

১৯৭২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীকীর্তিরাজ প্রভুকে লিখিত এক চিঠিতে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন —

"বিবাহ সংক্রান্ত উপদ্রবের দ্বারা আমি একেবারেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। কেননা প্রায় প্রতিদিনই কোনো না-কোনও স্বামী বা স্ত্রীর কাছ থেকে আমি নানা রকম নালিশ পাচ্ছি। আর বাস্তবিকই একজন সন্ন্যাসী হিসাবে আমি তো আর বিবাহের ঘটক হতে পারি না। সুতরাং এখন থেকে আমি আর কোনও বিবাহের অনুমোদন করছি না। তবে যারা বিবাহ করতে ইচ্ছুক, তাদের একথা অবশ্যই অগ্রিম জেনে রাখা দরকার

এবং এই ব্যাপারে প্রস্তুত থাকাও প্রয়োজন যে স্বামীকে বাইরে থেকে উপার্জন করে তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করতে হবে এবং মন্দিরের বাইরে ঘর নিয়ে বসবাস করতে হবে—এই ব্যাপারে মন্দিরের উপর নির্ভর করা চলবে না। মন্দিরে স্বামী-স্ত্রী পৃথকভাবে বাস করবে। এটা অবশ্যই করতে হবে। তাই যদি না হবে তো আমাদের এই পারমার্থিক সংস্থার কী অর্থ থাকতে পারে? বিবাহের এই বাড়তি সুবিধাটুকু আমি দিয়েছিলাম—কিন্তু যা এতই সমস্যার সৃষ্টি করছে তাকে আমি আর উৎসাহ দিই কেমন করে?"

স্বাভাবিক বৈরাগ্য

শ্রীল প্রভুপাদ কখনোও কখনোও বলেছেন যে গৃহস্থ দম্পতি বিশেষত আশ্রমবাসী স্বামী এবং স্ত্রী যেন পৃথকভাবে বসবাস করে (*প্রভুপাদ শিক্ষামৃত, পৃঃ ৮৬৬*)। আবার কখনো কখনো স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন (*শিক্ষামৃত, পৃঃ ৮৬৭*)। কখনো তিনি বিবাহে উৎসাহ দিচ্ছেন, কখনো কখনো একেবারেই উৎসাহ দিচ্ছেন না। এগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তা নয়। দেশ, কাল ও পাত্রের পার্থক্য অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপযোগী বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন।

যার মনে স্ত্রীসঙ্গের বাসনা প্রবল, তার পক্ষে জোর করে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এবং অযৌক্তিক। আবার বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করা অনেক গৃহস্থের ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। সুতরাং কৃত্রিমভাবে বৈরাগ্যের অনুশীলন করতে গিয়ে মনে মনে ভোগের চিন্তা করা সম্পূর্ণরূপে ভক্তির প্রতিকূল। সেই ধরনের কৃত্রিম বৈরাগ্য অবলম্বনকারীকে শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যাচারী বা ভণ্ড বলে আখ্যা দিয়েছেন। (*গীতা ৩/৬*)

ভক্তিযোগে কৃত্রিমভাবে কোনোকিছুই অনুষ্ঠান করা হয় না। কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই ভক্তিযোগের অনুশীলন করা যায়। স্বামী-স্ত্রী যখন পরস্পরের প্রতি আসক্ত, তাঁরা একসঙ্গে থাকবেন বটে, তবে হরিনাম জপ তথা শ্রবণ কীর্তনরূপ নববিধা ভক্তি থেকে কখনই বিরত হওয়া চলবে না। প্রথম দিকে ভক্তের সঙ্গে মায়ার যুদ্ধ চলবে। অনেকের ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ কিছুটা দীর্ঘকালীন বলেও মনে হতে পারে। একদিকে বিষয় চিন্তা এবং অপরদিকে হরিনাম—এই যুদ্ধে মুহূর্তের জন্যও পিছপা হওয়া উচিত নয়—কেননা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*—অর্থাৎ যদিও মায়া খুব শক্তিশালী, যিনি হরিনাম জপকীর্তন, হরিকথা শ্রবণ কীর্তনরূপ যুদ্ধে কখনও পিছপা হন না, তিনি মায়াকে অতিক্রম করবেন। ক্রমে ক্রমে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পরস্পরকে ভুলে যাবেন। এটাই স্বাভাবিক বৈরাগ্য।

নারীর সতীত্ব

বৈদিক যুগে বিবাহ-বিচ্ছেদ ছিল একটি অর্থহীন শব্দ। তখনকার গৃহস্থরা স্বপ্নেও বিবাহ-বিচ্ছেদ করতেন না। পরিবার জীবনের সেই স্থিতিশীলতার মূলে প্রধান ভূমিকা ছিল নারীর।

বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সতীত্বকে এক মহামূল্যবান মণির মতোই সংরক্ষণ করা হত। কারও ঘরে যদি কোনও মূল্যবান মণিরত্ন থাকে, তা হলে সহজেই চোর-ডাকাতেরা আকৃষ্ট হয়। তাই বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত পিতা তাঁর কন্যাকে পরম নিরাপদে রক্ষা করতেন। মহামূল্যবান মণিরত্নের মতোই তাঁকে অন্তঃপুরে কালযাপন করতে হত, যাতে সুযোগসন্ধানী শৃগালেরা তাঁর সতীত্ব হরণের সুযোগ না পায়। এমনকি, বিবাহিত মহিলারাও অন্তঃপুরে থাকতেন। কদাচিৎ আবৃত পাল্কীতে করে সুরক্ষিত অবস্থায় সসম্মানে বাইরে যেতেন। অবিবাহিত মেয়েদের খুব

অল্প বয়সেই পাত্রস্থ করা হত। সাধারণত ৮ থেকে ১১ বছর বয়সের মধ্যেই মেয়েদের বিয়ে হত। এর ফলে স্ত্রী হত অত্যন্ত সতী এবং পতিব্রতা। বাল্যকালে সে যাকে স্বামী রূপে বরণ করত, বিবাহের প্রথম রাত থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, সে তাকে ক্ষণকালের জন্যও ভুলতে পারত না। কেননা বাল্যকালে স্বাভাবিকভাবেই তারা নির্মল চরিত্র এবং নিষ্কপট। তাই তাদের সতীত্বের কোনও তুলনা হত না। তারা তাদের নিষ্কপট হৃদয়ে স্বামীকে এত গভীরভাবে ভালবাসত যে, স্বামীর মৃত্যুর পর বেঁচে থাকা তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হত। স্বেচ্ছায় তারা সতীদাহ বরণ করত।

অবশ্য এখন আর আমরা সেই যুগের পরিবেশ প্রত্যাশা করি না। তবে নারীর সতীত্বকে রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা অভিভাবকদের করতে হবে। সেই দিকে গুরুত্ব দিতে হলে, মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। বাঁশ যখন শক্ত এবং হলদে হয়ে যায়, তখন তা আর নমনীয় থাকে না। ঠিক তেমনি অধিক বয়সে বিবাহিত মেয়েরা প্রায়শই স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না। সতীত্বেরও অভাব হয়। ফলে সহজেই ঘটে বিবাহ-বিচ্ছেদ।

আকস্মিক সন্ন্যাস

অনেক সময় গৃহস্থ ভক্তরা অনুপযুক্ত সময়ে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে গুরুদেবের কাছে চিঠি লিখে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ এরকম আকস্মিক সন্ন্যাসের দাবী কখনও মানতেন না। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী বর্তমানে সহজে তিনি সন্ন্যাসের অনুমতি দিতেন না।

বৈদিক ব্যবস্থায় সাধারণত স্বামীর বয়স যখন ৫০, তখন সন্তান তার মায়ের দায়িত্ব নেওয়ার উপযুক্ত হয়। পুত্রের হাতে স্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করে স্বামী তখন বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস নিতে পারেন। অসময়ে, যখন

ভক্তের চেতনাও যথেষ্ট আসক্তিমুক্ত নয়, কৃত্রিমভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করা ঠিক নয়। সুতরাং স্ত্রী বর্তমানে সহজে সন্ন্যাস গ্রহণ বাঞ্ছনীয় নয়। বিবাহের উদ্দেশ্য, কৃষ্ণভক্ত সন্তান উৎপাদন। স্ত্রীও বহু সন্তান চাইতে পারে। সন্তানই যদি না হবে, তো গৃহস্থ আশ্রমের অতবড় বোঝা মাথায় নেওয়া কেন? যে পুরুষ গৃহস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁর পক্ষে বিবাহের কয়েকদিন পরেই সন্ন্যাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া অনুচিত।

সন্ন্যাসই যদি কাম্য হয় তো ছেলেখেলার মতো বিবাহ কেন? বিবাহ এক গুরুতর দায়িত্ব। এটি অত হাল্কা নয় যে, যে কেউই ইচ্ছে হলেই কেটে পড়বে। কারও ভাবা উচিত নয় ঃ "ও, আমি এখন বিয়ে করব, আর আমি যদি আমার স্ত্রীকে পছন্দ না করি, কিংবা অন্য কোনো অসুবিধা হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার গুরুদেবকে চিঠি লিখব—সন্ন্যাস দাও। ব্যস্, স্ত্রীর কথা ভাবার কোনও দরকার নেই, সে নরকে চলে যাক্" ইত্যাদি।

এটি আদৌ ভাল প্রস্তাব নয়। বিবাহ জীবন এক গুরুতর বিষয়। স্ত্রী গ্রহণ করলে অবশ্যই জীবনভর তার পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে। স্ত্রীও অব্যর্থভাবে স্বামীর অনুগত হয়ে তাঁর সেবা করবে। স্বামী স্ত্রীকে কৃষ্ণভাবনার উপদেশ দেবেন ঠিক তাঁর গুরুর মতোই। গুরুদেবের মতোই দৃষ্টান্তের মাধ্যমেও স্বামী স্ত্রীকে শিক্ষা দেবেন। শুধু মুখে নয়। অন্যথায়, স্বামীহীন নারীর পক্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা খুব কঠিন।

গৃহস্থ আশ্রমে উৎসাহ

সাধারণত দু ধরনের মানুষ গৃহস্থ আশ্রমকে বরণ করে থাকেন—(১) পরমহংস এবং (২) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালনে অক্ষম।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল প্রভুপাদের মতো ব্যক্তিরাও গৃহস্থ আশ্রমকে বরণ করেছিলেন। ইসকনে এখনও বহু গুরু এবং জি বি সি রয়েছেন, যাঁরা গৃহস্থ। অনেক সময় পরমহংস স্তরের বৈষ্ণবরাও আদর্শ গৃহস্থ জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য গৃহস্থ আশ্রমকে বরণ করেন। তাঁদের ক্ষেত্রে গৃহস্থ হওয়া না হওয়া সমান।

দ্বিতীয় প্রকারের গৃহস্থরা হলেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালনে অক্ষম ব্রহ্মচারী। এঁরা জীবনের নিম্নস্তরে রয়েছেন। কেউ কেউ এই সমস্ত নিম্নস্তরের ব্রহ্মচারীদের জোর করে ব্রহ্মচারী বানিয়ে রাখতে চান এবং তাঁদের গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করতে বাধা দেন। এই ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঃ

"সন্ন্যাসী, যিনি সব কিছু ত্যাগ করেছেন, পরিবারবর্গের সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন, তাঁর পক্ষে কি বিবাহ অনুষ্ঠানে উৎসাহ দান করা উচিত? ভগবান এখানে *(গীতা ১৮/৫)* বলেছেন যে, মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য যে যজ্ঞ, তা কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। বিবাহ যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে সংযত করে শান্ত করা, যাতে সে পরমার্থ সাধনের পথে এগিয়ে যেতে পারে। অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই 'বিবাহ যজ্ঞ' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন যাপন করা উচিত এবং তাদের এই ভাবে অনুপ্রাণিত করা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের কর্তব্য।" *(ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য—গীঃ ১৮/৫)*

যাঁরা জীবনের নিম্নস্তরে রয়েছেন, তাঁরা উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের অনুকরণ করতে অক্ষম। তাকে যদি জোর করে উচ্চস্তরের সন্ন্যাসীদের মতো জীবন যাপন করতে বলা হয়, তা হলে সে হয়তো অবৈধভাবে তার কামবাসনাকে চরিতার্থ করবে। সুতরাং যাঁরা জীবনের নিম্নস্তরে রয়েছেন, তাঁদের গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা উচিত নয়। সন্ন্যাসীদেরও কর্তব্য তাঁদের গৃহস্থ আশ্রমে অনুপ্রাণিত করা।

নিরাপত্তাবিহীন গার্হস্থ্য

শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়শই বলতেন, পুরুষও ভাল, মেয়েরাও ভাল, তবে, দুজনে যখন একসঙ্গে থাকে, তখন দুজনেই মন্দ হয়ে যায়। *(শিক্ষামৃত পৃঃ ৮৭১)*

সাধারণতঃ দেখা যায় যে-সমস্ত নারী-পুরুষের ব্যবহার সাধারণতঃ মিষ্টি, তাঁরাও যখন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন তাঁদের মধ্যেও দাম্পত্য কলহাদি ছাড়াও কতো রকমের পারিবারিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মচারী অবস্থায় একজন পুরুষ যে-রকম চমৎকার সেবাকার্য করতে পারেন, বিবাহিত পুরুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পারেন না।

আবার মেয়েদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে তারা যদি স্বামী সংস্পর্শ থেকে একটু দূরত্ব বজায় রাখে, তা হলে দাম্পত্য কলহও যেমন কম হয়, তেমনি আবার তাদের সেবাকার্যও বেশ সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়।

এজন্যই বৈদিক গৃহস্থাশ্রমী পুরুষ বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া অন্তঃপুরে যান না। মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করে দেখিয়েছেন যথার্থ গৃহস্থ জীবনে স্বামী এবং স্ত্রী কেমন করে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখতে পারেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও এই বিষয়ে চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

অধিকাংশ গৃহস্থ জীবন একপ্রকার আপোস মীমাংসা মাত্র। ব্রহ্মচারীরা বিবাহ করতে বাধ্য নয়। কেউ যদি ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে পারে, সেটাই সর্বোত্তম। এই জীবনেই ভজনে পূর্ণতা লাভ করে সে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

গৃহস্থ জীবনে কী সুযোগ রয়েছে? এসব বিবেচনা করতে হবে। ব্রহ্মচারীদের পক্ষে সর্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা করা কত সহজ। গৃহস্থ হলেই তাকে চাকরি বা ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। মন্দিরের বাইরে আবাসগৃহের ব্যবস্থা করা, স্ত্রীর গয়না, শাড়ি, এবং কাম বাসনাদি অসংখ্য চাহিদা পূরণ করা—ইত্যাদি হেয় কাজে বহু সময় নষ্ট হয়ে যায়।

সুতরাং যিনি এই জন্মেই ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে বদ্ধপরিকর, তাঁর পক্ষে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যই নিরাপদ। সন্তান লাভের প্রয়োজন ছাড়া গৃহস্থেরও কর্তব্য কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করা। অন্যথায় গৃহস্থ জীবন একেবারেই নিরাপত্তাবিহীন।

গৃহস্থও পরম পদ প্রাপ্ত হতে পারেন

কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী—শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাঁর একমাত্র প্রয়োজন। যিনি নিষ্ঠাসহকারে, নাছোড়বান্দা হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় লেগে থাকবেন, তিনিই পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ করবেন।

চারটি নিয়ম তাঁকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে এবং কমপক্ষে ষোলমালা জপ করতে হবে। এই সমস্ত নিয়মগুলি হচ্ছে আমাদের পারমার্থিক শক্তির উৎস। এই রকম পারমার্থিক শক্তিতে শক্তিমান গৃহস্থ যখন অনুরূপ স্বভাববিশিষ্টা ধর্মপত্নী লাভ করেন, তখন তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান। *(শিক্ষামৃত, পৃষ্ঠা ৮৭২)*

গৃহস্থদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন বিশেষ যোগ্যতাবিশিষ্ট—বিশেষতঃ পরিচালনা সংক্রান্ত সেবায়। মন্দিরের যে-কোন বিভাগের পরিচালনায় অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন বলে শ্রীকরন্ধর প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের প্রীতিভাজন হয়েছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর ইচ্ছামতো যে-কোনও বিভাগ বেছে নিয়ে তিনি সেবা করে যেতে পারেন। করন্ধর প্রভুর পত্নীকেও শ্রীল প্রভুপাদ এক মহীয়সী ভক্তরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং করন্ধর প্রভুকে তাঁর পত্নীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শ্রীগুরুদেব পূর্ণরূপে প্রসন্ন হলে গৃহস্থও পরম পদ প্রাপ্ত হতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন পত্র থেকে বোঝা যায়, নিঃসন্দেহে

তিনি তাঁর অনেক গৃহস্থ শিষ্যের সেবায় বিশেষভাবে প্রসন্ন ছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, "গৃহস্থদের পক্ষে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার পথে কোনও প্রতিবন্ধকই নেই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধিকাংশ পার্ষদই ছিলেন গৃহস্থ এবং তাঁদের সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর সংকীর্তন প্রচারে সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেছিলেন এবং তখন বিশেষতঃ স্বরূপদামোদর তাঁকে সাহায্য করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রভু, গদাধর দাস এবং শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ গৃহস্থ ভক্তদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।"

(শিক্ষামৃত, পৃষ্ঠা ৮৭২)

বিবাহ বিচ্ছেদের কুফল

দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামীর কারণেই হোক কিংবা অসতী স্ত্রীর কারণেই হোক— বিবাহ-বিচ্ছেদ যখন ঘটে, তখন নানা রকমের গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও স্ত্রীর একটি বা একাধিক সন্তানও থাকতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের ভরণ-পোষণ করা স্ত্রীর পক্ষে এক অসহনীয় বোঝা হয়ে ওঠে।

কোনো কোনো ধনী দেশে, সরকার সেই সমস্ত শিশুদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। আমেরিকার মতো ধনী দেশগুলিতে ওই সব পিতৃহীন (পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত) সন্তানের সংখ্যা এত বেশি যে সরকার পক্ষও ব্যতিব্যস্ত এবং দিশেহারা হয়ে পড়ছেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শান্তিময় পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হয়ে সেই সমস্ত শিশুরা সমস্যামূলক শিশুতে রূপান্তরিত হয়। কখনও বা মায়েরাই শিশুকে ত্যাগ করে। এভাবে পিতা-মাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত শিশুরা সমাজের আগাছার মতো বড় হয়ে নানা রকম

উৎকট সমস্যার সৃষ্টি করে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, 'আমরা প্রত্যাশা করি না আমাদের মন্দিরগুলি বিধবা কিংবা স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত পত্নীদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠুক। তা হলে সমাজের কাছে আমরা হাস্যাস্পদ হয়ে উঠব' *(শিক্ষামৃত, পৃ ৮৭০)*

ঐ সমস্ত পরিত্যক্ত পত্নী এবং বিধবাদের এবং অনেক সময় তাদের সন্তান-সন্ততির ভরণ পোষণ করা মন্দিরের পক্ষে এক বিরাট বোঝা হয়ে উঠবে। বিবাহ বিচ্ছেদের অপর একটি গুরুতর কুফল হচ্ছে অবৈধ যৌনসঙ্গ এবং অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম কিংবা ভ্রূণ হত্যা। এভাবে হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠা আমাদের লক্ষ্য নয়। অথচ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যে-দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ যত বেশি, সেই দেশেই এই সমস্ত গুরুতর সমস্যা তত বেশি। বন্য পশুদের জীবনে পারিবারিক কোনও স্থিতিশীলতা নেই। দ্বিপদ নরপশুরা যদি বন্য পশুদের অনুকরণ করে, তা হলে অচিরেই সমাজ একটি জঙ্গলে পরিণত হবে। বড় বড় নগরগুলি ইতিমধ্যেই সিমেন্টের জঙ্গলে পরিণত হয়ে গেছে।

উপযুক্ত স্বামীর আশ্রয় না পেলে স্ত্রীদের যে কী দুর্গতি হয়, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে না গেলে তা সহজে বোঝা যায় না। স্ত্রীজাতি অবলা, অল্পবুদ্ধিমতী। উন্নত কৃষ্ণভক্ত স্বামীর সাহায্য ছাড়া তাদের পক্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন দুরূহ ব্যাপার। কৃষ্ণভাবনায় উন্নত স্বামীর চরণকে শক্তভাবে ধরে রাখলেই স্ত্রীর পক্ষেও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ সহজ হয়। কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবনই হয়ে ওঠে হতাশায় জর্জরিত।

স্ত্রীকে সুরক্ষা দান করা স্বামীর কর্তব্য

কৃষ্ণভাবনাময় বিবাহ এমন কোনো সস্তা জিনিস নয় যে খামখেয়ালি

মতো তাকে জড়িয়ে ধরব এবং পরমুহূর্তেই ছুঁড়ে ফেলে দেব। বিবাহে ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রী যেন পরস্পরকে সমগ্র জীবনকাল ধরে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে। প্রয়োজনে বাইরে কাজ করে, বাইরে কোনও ঘর নিয়ে সন্তান লালন-পালন করতে হবে। এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

বিবাহ বন্ধন এক গুরুতর দায়িত্বের বন্ধনও বটে। কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থ এই দায়িত্বকে কখনও হীন চোখে দেখেন না। অন্যথায় বিবাহ একটি প্রহসন মাত্র।

একটু অশান্তি হলেই স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যাওয়া—সে তো সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষেও করছে। এমনকি সাধন ভজনের দোহাই দিয়েও, অকস্মাৎ স্ত্রীকে ত্যাগ করা উচিত নয়। একবার যদি এই গৃহস্থ আশ্রমকে বরণ করা হয়, তখন গৃহস্থকে সমস্ত অসুবিধা সহ্য করেও তার স্বধর্ম পালন করতে হবে।

অবশ্য পুরুষের পক্ষে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকাটাই শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু অনেক মহিলাও কৃষ্ণভক্ত হতে চাইছে। আমরা তাদের ত্যাগ করতে পারি না *(শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষামৃত, পৃষ্ঠা ৮৬৯)*।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন যে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র—সকলেই তাঁর আশ্রয় নিয়ে শুদ্ধ হতে পারে। সুতরাং এদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। এই সংরক্ষণের জন্যই মেয়েদের বিবাহিতা হওয়া প্রয়োজন।

অবশ্য মেয়েরা যদি অবিবাহিতা থাকতে পারে এবং মন্দির যদি তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে—সেটাও মন্দ নয় *(শিক্ষামৃত, পৃঃ ৮৬৯)*। যেমন, খ্রিস্টান গির্জাসমূহে অনেক সময়ে কুমারী মেয়েদের সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকে।

তবে যদি যৌন বাসনা থাকে, কেমন করে তা দমন করা যায়? সাধারণত মেয়েরা পুরুষদের থেকেও বেশি কামার্ত এবং তাদেরকে বলা হয় অবলা। সাধারণত স্বামীর সাহায্য ছাড়া মেয়েদের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক

প্রগতি সাধন করা খুবই কঠিন। বহু কারণে মেয়েদের বিবাহিতা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বিবাহের পর স্বামী যদি অকস্মাৎ স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যায়, তা হলে তা কখনই স্ত্রীর পক্ষে সুখদায়ক হতে পারে না।

গৃহে থাক বনে থাক, সদা হরি বলে ডাক

১৯৭৬ সালের ২৯ অক্টোবর, শ্রীপাদ তুষ্টকৃষ্ণ প্রভুর কাছে শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন ঃ

"আমি জানি, তুমি বুদ্ধিমান এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারে খুব সুন্দরভাবে সাহায্য করতে পার। যদি তুমি মনে কর, মায়া তোমাকে আকর্ষণ করছে, তা হলে গৃহস্থ আশ্রম বরণ করে সৎভাবে জীবন যাপন কর এবং আমাদের আন্দোলনে দান কর। গৃহস্থ হিসাবে তুমি স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে যোগদান করে ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউটের সেবায় সাহায্য করতে পার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, কে সন্ন্যাসী, কে গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র—তাতে কিছু যায় আসে না। তোমার বুদ্ধি আছে। খুব বেশি করে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন কর। যদি তুমি মনে কর, তোমার বিবাহ করা উচিত, তা হলে তা কর এবং সেবা দানের মাধ্যমে ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউটকে সাহায্য কর। একটি সাধারণ বোকা লোকের মতো হয়ো না, এই আমার অনুরোধ। জীবনের যে কোনও অবস্থায় কৃষ্ণভাবনামৃতকে সংরক্ষণ কর। সেটিই সাফল্য।" *(শিক্ষামৃত, পৃঃ ৮৭২)*

কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থ গৃহের কলুষ থেকে মুক্ত

নবীন ভক্তরা যখনই কোনও অসুবিধা বা সমস্যার সম্মুখীন হন, তখনই মনে করেন যে, বাহ্য পরিবেশ এবং পরিস্থিতিই বুঝি সমস্যার কারণ। এই ভেবে তাঁরা বাহ্য পরিবেশের প্রভাব থেকে রেহাই পাওয়ার

জন্যে এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে নিজেকে স্থানান্তরিত করেন। মন্দিরে আশ্রিত ভক্তরা এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে যেতে চায়। গৃহস্থ ভক্ত অসময়ে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস নিতে চায়।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, এইভাবে বাহ্য পরিস্থিতিকে সমস্যার মূল কারণ বলে মনে করা একটি ভুল বিচার *(শিক্ষামৃত পৃঃ ৮৭০)*। এটি সত্য নয়। এই জড় জগতের সর্বত্রই সমস্যা—যে পরিবেশে আর যে অবস্থাতেই আমরা থাকি না কেন। সুতরাং শুধুমাত্র আমাদের বৃত্তি পরিবর্তন করে কিংবা আশ্রমের পরিবর্তন করে আমাদের কোনও লাভই হবে না।

আসল ঘটনা হচ্ছে এই যে, বাইরের কোনো পরিস্থিতি বা কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে যদি আমি সমস্যা অনুভব করি, তা হলে বুঝতে হবে যে এই সমস্যাটির মূলে রয়েছে আমারই কৃষ্ণভাবনার অভাব। কোন পরিস্থিতি বা ব্যক্তির দোষে নয়, আমারই হৃদয়ে কৃষ্ণভাবনামৃতের অভাব থাকার ফলেই সমস্ত প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

সুতরাং কোনো গৃহস্থ যদি মনে করে, গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তা হলে তা ভুল। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যক্তি অবশ্যই গৃহত্যাগ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করতে পারেন। কিন্তু গৃহে থাকাকালীনও যিনি আদর্শ কৃষ্ণভক্ত, তিনি কখনই গৃহের কলুষে কলুষিত হন না। জলে থাকলেও পদ্ম পাতায় যেমন জল লাগে না, তেমনি গৃহে থাকলেও তাঁর চেতনা গৃহাসক্তি থেকে মুক্ত থাকে। অবশ্য কলুষিত চিন্তায় জর্জরিত হয়েও অনেকে নিজেকে পদ্মপাতার মতো নিষ্কলুষ বলে জাহির করতে পারে, তাতে কোন লাভ নেই। যিনি প্রকৃতই গৃহের কলুষ থেকে মুক্ত, তিনি নিজেও উদ্বিগ্ন হন না। অপরকেও উদ্বেগ দেন না। কৃষ্ণভাবনামৃতের আনন্দময় প্রভাবে

তিনি গৃহে থেকেও উদ্বেগহীন জীবন যাপন করতে পারেন। না হলে বনে গিয়েও উদ্বেগের শেষ নেই।

উদ্বিগ্ন করেন না, উদ্বিগ্ন হন না

আমাদের কখনই ভাবা উচিত নয় যে, আমাদের পারমার্থিক উন্নতি কোনো জাগতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। গার্হস্থ্য কিংবা বানপ্রস্থ—ইত্যাদি আশ্রমগত পার্থক্যের উপরও ভক্তির বিকাশ নির্ভর করে না। পরিপক্ব অবস্থায় ভক্ত মনে করেন, বর্তমানে আমি যে পরিস্থিতিতে রয়েছি, যে আশ্রমে রয়েছি, সেটিই শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপা। সুতরাং সকল পরিস্থিতিতেই যথাসম্ভব কৃষ্ণসেবার সুযোগ নিতে হবে এবং গুরুদেবের ব্রতকে বাস্তবায়িত করতে হবে। বিবাহের পর অনেক গৃহস্থ মনে করেন, বিবাহ করে তিনি ভুল করেছেন, কেননা এর ফলে তাঁর বুঝি পারমার্থিক ক্ষতি হচ্ছে। এক্ষেত্রে শ্রীল প্রভুপাদের পরামর্শ হচ্ছে এই যে, আমরা যদি আমাদের ব্যক্তিগত প্রগতি বা সুখ কিংবা সেই রকম কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে চিন্তা করি, তা হলে তা হবে জাগতিক বিবেচনা মাত্র *(শিক্ষামৃত ৮৬৯)*। বিবাহ যদি যন্ত্রণাদায়ক হয়, বিবাহের আগেই তা বুঝতে হবে। জানতে হবে। কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর হা-হুতাশ করা আর উচিত নয়। যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। ভাবনা চিন্তা না করে বিবাহ করা যেমন শিশুসুলভ, আবার ভাবনা-চিন্তা না করে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস গ্রহণও তেমনি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে—

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো
লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈ
র্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

'যিনি কাউকে উদ্বেগ দেন না, যিনি নিজেও উদ্বিগ্ন হন না, যিনি সুখ দুঃখ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়' *(গীতা ১২/১৫)*

সুতরাং ভুল করেই হোক কিংবা পরিস্থিতির চাপেই হোক, যিনি একবার গৃহস্থ হয়ে গেছেন, গৃহস্থ আশ্রমের অনিবার্য যন্ত্রণায় তিনি কখনও উদ্বিগ্ন হন না। সন্তানের জ্বালাতন, স্ত্রীর কটু কথা—কোনও কিছুতেই তিনি উদ্বিগ্ন হন না। আবার অসময়ে গৃহত্যাগ করে তিনিও কাউকে উদ্বিগ্ন করেন না। এই ব্যাপারে এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং।

গৃহস্থ আশ্রম ভক্তির প্রতিবন্ধক নয়

বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ অবৈদিক। তবে যদি এমন দেখা যায় যে, স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই খুব উন্নত ভক্ত এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে স্ত্রী যদি অত্যন্ত আনন্দিতভাবে স্বামীকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দেন, তা হলে বিচ্ছেদ সম্ভব এবং তা সঙ্গত।

তবে এক্ষেত্রেও সন্ন্যাস গ্রহণের সময় স্বামীকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে স্বামীর অনুপস্থিতিতেও স্ত্রীর কোনো অসুবিধা না হয়। স্ত্রী যাতে নিরাপদভাবে সংরক্ষণ পায় এবং তাকে যেন ভালভাবে যত্ন নেওয়া হয়—সেই সম্বন্ধে স্বামীকে নিশ্চিত হতে হবে।

স্ত্রীকে নিরাপত্তাহীন এবং অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে সন্ন্যাস গ্রহণ করা স্বামীর উচিত নয়। কেউ হয়ত স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সন্ন্যাস নিয়ে থাকে এবং তার ফলে স্ত্রীকে অনেক সময় দুঃখের মধ্যে জীবন যাপন করতে হয়। স্ত্রী মানসিক দিক থেকে অসুখী জীবন যাপন করে।

তাই শ্রীল প্রভুপাদ সেই রকম সন্ন্যাস অনুমোদন করেননি। তিনি

ভবিষ্যতের গৃহস্থ ভক্তদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাই উত্তর পুরুষরা যাতে মন্দ দৃষ্টান্তের প্রভাবে ভুল পথে ধাবিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদ খুব সতর্কভাবে সন্ন্যাস অনুমোদন করতেন।

ইচ্ছা হলেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দুদিন যেতে না যেতেই বিবাহ-বিচ্ছেদ যুক্তিযুক্ত নয়। এখানে এই অজুহাত খাটবে না যে, গৃহস্থ আশ্রম ভক্তি জীবনের পক্ষে প্রতিবন্ধক। পারমার্থিক প্রগতি সম্পর্কে এটি হচ্ছে একটি ভ্রান্ত ধারণা।

স্বধর্ম অবশ্যই পালন করতে হবে। চার বর্ণ এবং চার আশ্রমের কোনও একটি স্তরকে আমার স্বধর্ম রূপে গ্রহণ করে নিযুক্ত হওয়ার পর তা খামখেয়ালিভাবে পরিবর্তন বা ত্যাগ করা আমাদের উচিত নয়—এটি সবচেয়ে বড় ভুল। ভক্তি এসবের উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং একবার আমি যা ঠিক করেছি, তাতে স্থির থেকেই শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমকে জাগ্রত করতে হবে। অর্জুনকে ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ করে ভক্ত হতে হয়নি, তেমনি গৃহস্থও তাঁর স্বধর্মে স্থির থেকেই শুদ্ধ ভক্ত হতে পারেন।